অপরাহ্ণের নদী

মিহির আচার্য

বুক সোসাইটি
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬৯

প্রকাশিকা : শ্রীশঙ্করী দেবী
১৭২।৩৫ লোয়ার সারকুলার রোড
কলকাতা-১৪

মুদ্রাকর : শ্রীসুলভকুমার বসু
এশিয়ান প্রিণ্টার্স
পি-১২, নিউ সি. আই. টি রোড
কলকাতা-১৪

প্রচ্ছদ : পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

শ্রদ্ধাস্পদেষু

নির্বাণীতোষের গল্প

রেডিওতে বার্তা সরবরাহ হচ্ছিল : এবার মালদার আম কলকাতায় চালান আসে নি। বৈশাখের গোড়ায় যে আমের মুকুল দেখা দিয়েছিল বৃষ্টির অভাবে আর অস্বাভাবিক গ্রীষ্মে সেগুলো শুকিয়ে কালো হয়ে ঝরে গেছে...

হিমানীশ হাত বাড়িয়ে রেডিও বন্ধ করে দিয়ে আমাদের দিকে ফিরে বলল, মালদার আমের কথা উঠলেই আমার নির্বাণীতোষের কথা মনে পড়ে।

আমরা প্রায় সমস্বরে চিৎকার করে উঠলাম, নির্বাণীতোষ কে?

মালদার আম খাওয়াত। ওর বাড়িও মালদায়। ঠিক শহরে নয়, কিছু দূরে বাঙ্গিটোলা বলে এক গ্রামে।—চেয়ারে কাত হয়ে বসল হিমানীশ : আমরা একসঙ্গে পোস্ট-গ্রাজুয়েট হস্টেলে থাকতাম। তা আজ বছর পাঁচ-ছয় আগের কথা। আমার ছিল পলিটিক্যাল সায়ান্স, ওর ফিলসফি। আমারই রুমমেট ছিল সে।—কথা শেষ করে চুপ করে কি চিন্তা করতে লাগল হিমানীশ।

আমরা গল্পের গন্ধে ভেতরে ভেতরে উত্তেজনা বোধ করছিলাম। বাইরে এতক্ষণ পর চাপা গুমটের আলস্য ভেঙে হাওয়া উঠেছে। জানলার বাইরে নারকেলগাছটা শাখা-প্রশাখা দুলিয়ে আনন্দের প্রকাশ জানাচ্ছে।

ঘরের ভেতরে আমরা তিনজন প্রাণী নিস্তব্ধ বসে। দেয়ালের ঘড়িটা কোন-কিছু ভ্রূক্ষেপ না করে সময়-সমুদ্রে সাঁতার কেটে চলেছে।

আমরা ঠাট্টা করে বলতাম, 'মালদার' লোক।—হিমানীশ জানলার বাইরে দৃষ্টি সুদূরসন্ধানী করে বলল, ঠাট্টা করলেও আসলে ও ছিল টাকাপয়সাওলা মানুষ। গোটা চারেক আমবাগান ছিল ওদের। আর ওদিকে আমবাগান থাকা মানেই অল্পবিস্তর শাঁসালো লোক। ছাত্রজীবনে কোনদিন টাকার টানাটানিতে পড়তে দেখি নি ওকে। তবু—

একটু থেমে বলল হিমানীশ, পোস্ট-গ্রাজুয়েটের পাঁচিল সে ডিঙোতে পারল না। পারল না বলি কি করে? কোথায় যেন একটা দুর্বলতা ছিল তার। অথচ আরও দশটা মালদার লোকের মত সে ছিল নির্ভেজাল ভালো মানুষ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা না কয়ে নির্বিকার ওকে ঘরে বসে থাকতে দেখেছি, আবার ঘর-ভরতি লোকের মধ্যে কি আশ্চর্যভাবে নিজের অস্তিত্বকেও তলিয়ে দিতে দেখেছি তাকে। যাকে বলে উদ্ভিদ্‌জাতীয় জীব, সে ছিল ঠিক তাই। তোমরা স্বীকার করবে কি না জানি নে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, এক-একটা অঞ্চলের জল-হাওয়া সে অঞ্চলের মানুষের প্রাকৃতিক গঠনকে নিয়ন্ত্রিত করে। বীরভূমের রুক্ষ লাল মাটির সঙ্গে মালদার নরম কালো মাটির পার্থক্য আছে। মালদার মানুষের অপরিশ্রমী প্রকৃতি আর কুঁড়েমি নরম মাটির দান। কেবল ইচ্ছার জোরের অভাবে কোন-কিছুতেই উৎসাহ পেল না নির্বাণীতোষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো কটা সিঁড়ি অতিক্রম করবার কোন চেষ্টাই সে দেখাল না—

হিমানীশ চুপ করবার আগেই দেয়াল-ঘড়িটা বেড়ালের মত ঘড়-ঘড় করে উঠল আর ক্রমান্বয়ে আটবার ঘণ্টা বাজার আওয়াজ শোনা গেল।

হিমানীশ কি মনে করে উঠে দাঁড়াল। একবার জানলার দিকে এগিয়ে গেল, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল জানলার গরাদ ধরে। এলোমেলো হাওয়ায় উড়তে লাগল ওর চুল। তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে দেয়ালের ক্যালেণ্ডারের ছবির দিকে তাকাল।

পায়চারি করতে করতে বলল এক সময়, সিক্‌স্‌থ ইয়ারে পরীক্ষার ফিজ জমা দিয়ে হঠাৎ একদিন উধাও হয়ে গেল সে। আর গেল তো গেলই। পরীক্ষার পরও ওর দেখা মিলল না। আমি হস্টেল ছেড়ে তখন শান্তিনিকেতন বোর্ডিংয়ে ডেরা বেঁধেছি—প্রায় এক বছর পর বাক্স-বিছানা-সমেত আমার বোর্ডিংয়ে এসে হাজির হল নির্বাণীতোষ। হেসে বলল, গত বছর তো হল না, এ বছর পরীক্ষা দেব। ফিজ দিতে এসেছি।

জিজ্ঞেস করলাম, এতদিন কোথায় ছিলে?

নির্বাণীতোষ বলল, মালদায় ছিলাম। আসব-আসব করে দেরি হয়ে গেল। ভাবলাম, বসে আছি, সময়গুলো কাজে লাগাই। বাঙ্গিটোলা থেকে কাছেই পঞ্চাননপুরে ইস্কুলে কাজ নিলাম। এক বছর ওখানেই আটকা পড়লাম।

হিমানীশ বলতে লাগল, পরীক্ষার ফিজ যথারীতি দিল সে। পরীক্ষার হপ্তাখানেক আগে আবার উধাও হল। কে জানে, সেই পঞ্চাননপুরেই চাকরি করতে গেল কি না!

অন্দরমহল থেকে হিমানীশ-গৃহিণীর কল্যাণে চার পেয়ালা চা এসে পৌঁছল। হিমানীশ আবার নিজের জায়গায় এসে বসল। তিন কাপ চা আমরা ভাগ করে নিয়ে এক কাপ গৃহস্বামীর জন্যে রেখে দিলাম।

চায়ের বাটি টেনে নিয়ে সশব্দে দীর্ঘ চুমুক দিল হিমানীশ, তারপর মুখ তুলে বলল, চার বছর শুধু কলকাতায় এল আর গেল নির্বাণীতোষ। প্রতিবারেই আসে পরীক্ষার ফিজ দিতে, তারপর পরীক্ষার কাছাকাছি সময় হঠাৎ বেমালুম অদৃশ্য হয়ে যায় সে। হেসে বলতাম, তুমি কি য়ুনিভার্সিটির প্রিমিয়াম দিতে আস বছর-বছর?

নির্বাণীতোষ হাসত: কী আর করি বল, এম. এ. পরীক্ষা দেবার সংকল্পটা তো আর মিছে নয়, শেষ পর্যন্ত সাহসে কুলোয় না, যত পরীক্ষার দিনগুলো কাছে আসে, সংকল্পটা ততই জলো ফিকে হয়ে যায়—

আমার কী মনে হয় জান?—হঠাৎ দার্শনিকসুলভ উদাসীনতায় হিমানীশ বলল, পৃথিবীতে এক-একজন লোক দেখা যায় যারা সারা জীবন একটা বৃত্তের মধ্যেই ঘুরতে থাকে। হঠাৎ বাইরে থেকে আচমকা ঢিল পড়লে পুকুরের জলের মতই বৃত্তটা বাড়তে থাকে, কিন্তু আসল বেগটা আসে কমে, আর এক সময় নিঃশেষে নিশ্চিহ্নও হয়ে যায়। মফস্বল-শহর থেকে কলকাতার মত বড় শহরে এসে নির্বাণীতোষের বৃত্তের পরিধি বেড়েছিল, বেগটা গিয়েছিল হারিয়ে—

আমি বললাম, বেগটা পুনরুদ্ধার করবার জন্যেই কি সে দেশ থেকে পালিয়ে আসত, তারপর অতদূর থেকে ছুটে এসে কলকাতায় পা দিতেই তার বেগ যেত নিঃস্ব হয়ে?

হিমানীশ আমার প্রশ্নের ওপর কোনও রায় দিল না। ঘন ঘন চায়ে চুমুক দিতে দিতে কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে রইল সে। মনে হল, ওর কথার মাঝখানে আমার কথা বলাটা পছন্দ হল না তার।

দীর্ঘদিন নির্বাণীতোষ নিখোঁজ হয়ে রইল। যেন হারিয়ে গেল সে।—বলে আবার গভীর মৌন প্রশান্তির তলায় ডুব মারল হিমানীশ। ডুবুরীর মত অতল গভীর থেকে হারানো স্মৃতির টুকরোগুলোকে খুঁজে আনতে লাগল। তারপর সফল ডুবুরীর মতই সে এক সময় বর্তমান জগতে ভেসে উঠল।

হিমানীশ বলতে লাগল, নির্বাণীতোষের জীবনের দ্বিতীয় পর্বের শুরু এইখানে। আমি তখন কলকাতার উপকণ্ঠে এক কলেজে পড়াচ্ছি। কলেজ থেকে আমার কলকাতার বাসায় ফিরে নির্বাণীতোষের পোস্টকার্ড পেলাম। টালিগঞ্জ ছাড়িয়ে নাকতলার দিকে এক আত্মীয়ের বাড়িতে উঠেছে সে। সেই দিনই গেলাম ওর আস্তানায়। যখনকার কথা বলছি তখনও নাকতলায় ইলেকট্রিক আলো যায় নি, দু-একটি করে রিফিউজি আসতে লেগেছে মাত্র। প্রায়ই কাঁচা ঘর, আর রাস্তা ঘাটের বালাই নেই। বাসার একটা নম্বর ছিল বটে, কিন্তু

গাইড না পেলে তা আবিষ্কার করা সম্ভব হত না। যাই হোক, নির্বাণীতোষের দর্শন মিলল। কিন্তু কী চেহারা হয়েছে তার! পূজারী বামুনের মত কৃশকুটিল, মুখময় খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, ভাঙা গাল, চোখ দুটো গর্তে ডোবা।—চায়ের বাটিটা নামিয়ে রেখে আবার শুরু করল সে: চেহারার দীনতাকে অভ্যর্থনার ঘটা দিয়ে ভরিয়ে তুলতে চাইল নির্বাণীতোষ, বলল, এস এস। তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।

হেসে বললাম, কি ব্যাপার? চেহারাখানা তো খাসা বানিয়েছ! তা এবারও কি য়ুনিভার্সিটির প্রিমিয়াম দিতে এসেছ?

নির্বাণীতোষ বলল, কোন্ পরীক্ষা? দূর, ও আমার দ্বারা হবে না। আমি চাকরি খুঁজতে এসেছি।

চাকরি!—অবাক হয়ে বললাম, তোমার আবার পয়সার টানাটানি পড়ল কেন?

নির্বাণীতোষ বলল, আড়াই হাজার টাকা আমার দরকার। কিছু জমিয়েছি মাস্টারি করে। কাকাকে বললাম, কিছুতেই রাজী হল না।...তা তুমি কি বল, শ দেড়েক টাকার একটা চাকরি জুটলে, অন্তত পঞ্চাশ টাকা করে সেভিংস ব্যাঙ্কে জমালে, ক বছর আর লাগবে হাজার দুয়েক পুরতে, অ্যাঁ?

বললাম, টাকার প্রয়োজনটা অত্যন্ত জরুরী মনে হচ্ছে?

হ্যাঁ ভাই।—নির্বাণীতোষ বলল, হাজার দুয়েক টাকা হলেই প্যাসেজ মানিটা যয়ে যায়। হ্যানিয়ু আমাকে যেতেই হবে।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, হ্যানিয়ু! সে আবার কোন্ সৃষ্টিছাড়া জায়গা?

নির্বাণীতোষ বলল, পশ্চিম-জার্মানির একটা শহর। ও বলেছে প্যাসেজ মানি যোগাড় করে কোন রকমে একবার ওখানে পৌঁছলেই একটা ছোটখাট চাকরির যোগাড় সে করে দেবে। তার আগে একটু বোস, বউদিকে চা করতে বলে আসি। বেরিয়ে গেল সে।

হিমানীশ বলল, সব-কিছু কেমন গোলমাল গোলমাল ঠেকতে লাগল। না, কি মাথা খারাপই হল নির্বাণীতোষের! কলকাতা শহরেই যে লোকটা হিমসিম খায়, সে দেখছে কিনা হ্যানিয়ুর স্বপ্ন!

খানিক পরে ফিরে এসে আবার তক্তপোশের ওপর চেপে বসল নির্বাণীতোষ। কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে সলজ্জ ভঙ্গিতে চেয়ে রইল। যেন আমার মনোভাবকে ধরবার চেষ্টা করছিল সে। তার পর থেমে থেমে যে রহস্য প্রকাশ করল আমার কাছে, বিস্ময় শতগুণে বেড়ে গেল আরও। ওর কথাগুলো একটু থিতিয়ে যেতেই জিজ্ঞেস করলাম, তুমি রইলে পশ্চিম-বাঙলার প্রত্যন্ত শহরের এক গ্রামাঞ্চলে আর তোমার সেই বিদেশিনী রইলেন জার্মানির কোন্ এক হ্যানিয়ু শহরে—আলাপটা জমল কি করে?

নির্বাণীতোষ বুদ্ধিমানের মত হেসে বলল, আলাপটা কখন কি ভাবে হয় তা কি বলা যায়? তবে এ ক্ষেত্রেও আমাদের হংসদূত আধুনিক সংবাদপত্র। বহুদিন থেকেই আমার হবি ছিল দেশ-বিদেশের পেন-ফ্রেণ্ড যোগাড় করা। আর এই অধ্যবসায়েরই ফল: জার্মান তন্বঙ্গী অ্যানি ম্যারি পিটারস। দাঁড়াও, ওর ফোটো আর চিঠিগুলো দেখাই—

উঠে গিয়ে সুটকেশ খুলতে যতটুকু সময় লাগে তার মধ্যে ফোটোর অ্যালবাম আর এয়ার মেলের এক তাড়া সুতোয়-বাঁধা চিঠি নিয়ে হাজির হল নির্বাণীতোষ! ফোটোর অ্যালবামটা প্রথমে আমার সামনে মেলে ধরল, বিভিন্ন পোজে তোলা ফোটো, রাইন নদীর তীরে বালুশয্যায় হুমড়ি খেয়ে শরীরের ঊর্ধ্বাংশ তুলে ধরে হাসছে মেয়েটি, মাথার বব-করা চুল উড়ছে, পেছন দিকে স্কার্টটা উড়ে গিয়ে সুপুষ্ট পায়ের অনেকটা অনাবৃত হয়ে পড়েছে—সুন্দরী নয়, লম্বাটে মুখ, কপাল ঈষৎ উঁচু। আবার কখনও দেখা যাচ্ছে তাকে পিকনিক পার্টির কলহাস্যের মধ্যে, বাড়ির পোর্চে বেতের চেয়ারে বসে কী-একটা

ছবির বই পড়বার অভিনয় করছে.. ছবির চেহারায় যদি বয়েস ধরা যায় তা হলে মনে হয় উনিশ-কুড়ির মতই হবে। চিঠির তাড়াগুলোও না-দেখিয়ে ছাড়ল না নির্বাণীতোষ। তারিখ লক্ষ্য করে পড়লে বোঝা যায়, কী করে ধাপে ধাপে তাদের বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয়ে উঠে গভীর প্রেমের রূপ নিয়েছে। মেয়েটি ভাল ইংরিজী জানে না, হাতের লেখাও সাধারণত ওদেশের মেয়েদের যেমন বিশ্রী, ওর লেখা তার চেয়েও কুৎসিত। কিন্তু এই কুৎসিত লিপির মধ্যেও প্যাশনের যে তীব্র বন্যা লুকিয়েছিল, তা নির্বাণীতোষ তো দূরের কথা, যে কোন মুনির তপোবল হরণ করতে পারত। কোন চিঠিতে ফরাসী কায়দায় সম্ভাষণ করেছে—'মনামি', জার্মানিতে কখন ডেকেছে 'মাইন লিব থ', ইংরেজীতে বলেছে : মাই ডিয়ারেস্ট নির্বাণী চিঠি শেষ করেছে ফরাসীতে 'মামি', জার্মানিতে 'অয়ার পিটারস', ইংরেজীতে 'ইয়োরস ফর এভার অ্যানি ম্যারি পিটারস', কখনও সংক্ষেপে অ্যানি।

চিঠি পড়া শেষ হলে নির্বাণীতোষ হেসে বলল, কী, এবার বিশ্বাস হয় তো ?

কিছু উত্তর দেবার আগেই চা এল।

হিমানীশ কথা শেষ করে কিছুক্ষণ নীরব হয়ে বসে রইল। বোধ হয় গুছিয়ে নিচ্ছিল নির্বাণীতোষের পরবর্তী জীবনের ঘটনাগুলি। আমরা কয়েকজন গল্পখোর ওর মুখের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলাম। বাইরে রাত্রি জেঁকে বসেছে। এতক্ষণ পর হাওয়াটাও বন্ধ হয়ে এসেছে। জানলার বাইরে নারকেলগাছটা অন্ধকারের কালি মেখে চিত্রার্পিতের মত স্তম্ভিত।

তারপর নীরবতা ভেঙে হিমানীশ আবার শুরু করল : পর পর কয়েকটা বছর নির্বাণীতোষ অবসর সময়ে অ্যানিকে ধ্যান করে আর দিনের বেলায় সদ্যোলব্ধ চাকরির জাবর কেটে কাটিয়ে দিল। আর আমি নীরবে ওর পরিবর্তনের স্তরগুলো লক্ষ্য করছিলাম। কুঁড়েমি

বা আলস্য নয়, কেমন এক প্রবল ঝোঁক এসেছিল ওর মধ্যে। এই ঝোঁকটা যে কতখানি ওর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল, বলতে পারি না। আবার এই ঝোঁকটা যে কতখানি তার পক্ষে মঙ্গলকর হবে, তাও কল্পনা করা সম্ভব ছিল না। যে নির্বাণীতোষকে বৃত্তবাসী-হিসেবে কল্পনা করতে অভ্যস্ত ছিলাম, চোখের সামনে তাকেই বৃত্ত-বাস ভেঙে এগিয়ে আসতে দেখে পুরুষকারের ওপর বিশ্বাস ফিরে পাচ্ছিলাম—

হিমানীশ একটু দম নিয়ে ম্লান হেসে বলল, হায় রে মানুষের কল্পনা! আমার সেদিনকার ভাবনা শুনে প্রকৃতি-শয়তানী হেসেছিল বুঝি—

আরও কী বলতে যাচ্ছিল সে, এমন সময় হিমানীশের ছ বছরের কন্যারত্ন এসে জানাল : বাবা, মা তোমাকে ডাকছেন।

হিমানীশ উঠতে-উঠতে বলল, একটু বোস তোমরা। আসছি।

হিমানীশ বেরিয়ে যেতেই আমরা নিজেদের মধ্যে ওর এই অসম্ভাব্য কাহিনী নিয়ে আলোচনা করতে লাগলাম। হিমানীশ এমন ভাবে নির্বাণীতোষের আখ্যান আরম্ভ করেছিল যে, তার সত্য-মিথ্যা বিচার করবার মত শক্তি আমাদের ছিল না। হিমানীশের গম্ভীর কণ্ঠস্বরের স্থির-বিশ্বাস আমাদেরও বিশ্বাসী করে তুলেছিল। পৃথিবীতে কত রকমের মানুষ, সকলকে চিনি না, জানি না বলেই কেন অবিশ্বাস করব?

কিছুক্ষণ পর ফিরে এল হিমানীশ। ধীরপায়ে এসে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আমাদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ, কী বলছিলাম?

গল্পের খেই ধরিয়ে দিতেই আবার শুরু করল সে : তারপর চাকরি আর ধ্যান নিয়ে প্রায় দুটো বছরই কাটিয়ে দিল নির্বাণীতোষ এই কলকাতা শহরের বুকে। এই দুই বছরে তার কত টাকা জমেছিল বলতে পারি না, একদিন সন্ধ্যাবেলা ওর ওখানে গিয়ে শুনলাম, সেই দিন দুপুরেই বাক্স-বিছানাসহ উধাও হয়ে গেছে সে।

কোথায় গেছে কেউ বলতে পারে না। বেশ একটা উৎকণ্ঠা নিয়ে ফিরলাম। ওর স্বভাবের সঙ্গে পরিচয় থাকলেও এই দু বছরে স্বভাবের সে দিকটা ভুলে গিয়েছিলাম। ভাবলাম, তবে কি হ্যানিয়ু যাবার রসদ যোগাড় হয়ে গেছে তার? কে জানে!

হিমানীশ একটু থেমে বলল, নির্বাণীতোষের জীবন-কাহিনীর পরে এখানেই পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিতে পারলে খুশি হতাম। আর তোমরাও নানা রকম কল্পনা করতে করতে বাড়ি ফিরে যেতে পারতে! কিন্তু নির্বাণীতোষের গল্প তো তার জীবনকে নিয়েই, তাই বুনো হাঁসের মত গল্পকেই জীবনের পেছনে ছুটতে হবে।—হিমানীশ আবার উঠে দাঁড়িয়ে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল।

দেয়ালঘড়িতে রাত্রি নটার সংকেত। আওয়াজটা থেমে মিলিয়ে গেলে যেন স্বগতোক্তির মতই বলল হিমানীশ: এক বছর পর। হ্যাঁ, এক বছরই হবে। দেখা হল নির্বাণাতোষের সঙ্গে। কিন্তু দেখা না-হলেই ভালো হত।

জানলার বাইরে দৃষ্টি মেলে দিয়ে বলল হিমানীশ, দেখা হল কলকাতায় নয়, কলকাতা থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে কাঁচরাপাড়া টি. বি. হাসপাতালে। ওর চিঠি পাওয়ার পরের দিন সকালেই গেছি ওর ওখানে। খুঁজতে খুঁজতে ওর কেবিনের পর্দা ঠেলে ঢুকতেই চমকে উঠলাম। উপুড় হয়ে শুয়ে বুকের নীচে একটা বালিশ দিয়ে নীল প্যাডে চিঠি লিখছে সে। আমার পায়ের শব্দে মুখ তুলে চাইল নির্বাণাতোষ, প্যাডটা মুড়ে রাখল বালিশের পাশে। রুক্ষ কোমলতা-বিহীন মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে বলল, বোস।

বিছানার সুমুখে চেয়ারটায় ধপ করে বসে পড়লাম।

অনেকক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে রইল নির্বাণীতোষ, তারপর ধরা গলায় বলল, খুব অবাক হয়েছ, না?

বললাম, তোমার অসুখটা তো অবাক হওয়ার বস্তু নয়, দুঃখের।

তোমরা দুঃখ করলেও তো আর অসুখ সারবে না।—কেমন নির্লিপ্ত আর বেসুরো শোনাল ওর কথাটা। নির্বাণীতোষ বলল উদাস গলায়, সত্যি, এত বড় অসুখটা কী করে আমার মধ্যে লুকিয়ে ছিল, কোনদিনও জানতে পারি নি। ডাক্তার বলেছেন, রোগটা নাকি অনেক দিন থেকেই ভেতরে ভেতরে তার কাজ শুরু করেছে। অথচ টাকাপয়সা যোগাড় সব কমপ্লিট, আমার ভাগের আমবাগান তিনটেই বেচে দিয়েছি। কলকাতায় এসে যাতায়াতের ব্যবস্থা-ট্যবস্থা করব, হঠাৎ এই বিপত্তি। কি বল, ভাগ্যিস টাকা হাতে ছিল, না হলে ফ্রী-বেডে বিনা চিকিৎসায় মারা যেতে হত—

নির্বাণীতোষের কাহিনীকে ওখানে থামিয়ে দিয়ে হঠাৎ আমাদের দিকে সোজাসুজি ফিরে দাঁড়িয়ে হিমানীশ গির্জার পাদরীর গলায় বলল, ওর টি. বি. হওয়াটা অস্বাভাবিক খাপছাড়া লাগছে, তাই না? কিন্তু আজ মনে হচ্ছে টি. বি. রোগটা যেন নির্বাণীতোষের চরিত্রের সঙ্গে খাপ খেয়ে গিয়েছিল। না-খেতে পেয়ে টি বি. হওয়ার কারণ আমরা জানি। আর এই নির্বাণীতোষদের মত লোকদেরও টি. বি. হওয়া খুব আশ্চর্য নয়, যারা অদ্ভুতভাবে রোমান্টিক, অদ্ভুতভাবে প্রেমিক—

একটু চুপ করে থেকে হিমানীশ আবার শুরু করল: ছটা মাস কাটল কলকাতা আর কাঁচরাপাড়া করে। প্রতি হপ্তায় শনিবার বিকেলে গেছি ওর ওখানে, গল্প করতে করতে সন্ধ্যে উতরেছে। জানলার বাইরে টিনের শেডের মাথায় চাঁদ উঠেছে, হাওয়ায় আন্দোলিত হচ্ছে লম্বা ঢ্যাঙা গাছের ডালপালা। দমকে দমকে হাওয়া এসে জানলা-দরজার পর্দা উড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। এই পরিবেশে অসুখের কথা চাপা পড়ে গেছে, নির্বাণীতোষের ক্ষুধার্ত চোখের তারায় দুলছে হ্যানিয়ুর মিস অ্যানি ম্যারি পিটারস-এর ছায়া...রাইন নদীর তীরে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, চুল উড়ছে, স্কার্ট উড়ছে, নগ্ন সুডোল পায়ের

অনেকটা দেখা যাচ্ছে...কতদিন কথা শেষ হয়ে গেছে, তবুও চুপ করে বসে রয়েছি দুজনে, নির্বাণীতোষের ধ্যান ভাঙিয়ে না পেরোছ কথা বলতে, না বিদায় নিতে।

সেদিন হাসপাতালে পৌঁছতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল।—চেয়ারে বসতে বসতে বলল হিমানীশ, এসে দেখলাম বিছানায় শুয়ে যন্ত্রণায় কেমন ছটফট করছে সে। চোখ মুখ অত্যন্ত ফ্যাকাসে নীরক্ত। ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, অসুখ বেড়েছে নাকি? নির্বাণীতোষ মূক ইঙ্গিতে এয়ার মেলের খামখানা দেখাল। অ্যানির চিঠি। নির্বাণীতোষের অসুখের খবরে গুরুতর চিন্তিত হয়েছে। লিখেছে যদি নির্বাণীতোষ ব্যবস্থা করতে পারে সে আসবে হ্যানিয়ু থেকে কলকাতায় তাকে দেখতে।

আমার চিঠি পড়া শেষ হলে নির্বাণীতোষ বলল, আচ্ছা, আমাদের সেই বন্ধু টাকির রায়চৌধুরীদের ছেলে—কী নাম যেন, বিশ্বনাথ, সে তো এখনও জার্মানিতে আছে, না?

বিশ্বনাথকে মনে পড়ল। ভালো থিয়েটার করতে পারত। আমাদের য়ুনিভার্সিটিতে পড়ার সময় সে ছিল মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। পি. জি. হস্টেলে যে কোন অভিনয়ের সময় বিশ্বনাথের উপস্থিতি নেহাতই জরুরী ছিল।

নির্বাণীতোষ বলল, বিশ্বনাথের ঠিকানা মেডিক্যাল কলেজের হাউস সার্জন ওর বন্ধু ডাঃ লাহিড়ীর কাছে পাবে। ওকে একটিবার লিখে দেখ না, ম্যারিকে যদি ওখান থেকে পাঠাবার ব্যবস্থাটা করে দিতে পারে। অবশ্য খরচা আমিই 'বেয়ার' করব।

হিমানীশ বলল: নির্বাণীতোষের জীবনের ক্লাইম্যাক্স এইখানেই। চমকে উঠো না। বিশ্বনাথ মনে করে চিঠির উত্তর দিয়েছিল। হ্যানিয়ুতে গিয়ে মিস অ্যানির ঠিকানায় ওর বাড়িতে, আপিসে খোঁজ নিয়েছিল সে। খবরটা সুখকর ছিল না। বিশ্বনাথ জানাল:

তোমাদের পাঠানো ঠিকানামত বাসায় এবং আপিসে খোঁজ নিয়ে জেনেছি অ্যানি ম্যারি পিটারস নামে কোন মহিলা সেখানে থাকেন না। ওই ঠিকানায় থাকেন জনৈক যৌবন-পার-করে-দেওয়া গত-যুদ্ধ-ফেরত কেরানী। ভদ্রলোক অসুস্থ প্রকৃতির। দু-একজন প্রতিবেশীর কাছে খবর নিয়ে ভদ্রলোকের যে পরিচয় জেনেছি তাতে সন্দেহ হয়, মিস অ্যানি ম্যারি পিটারস নামে পত্রগুলি তাঁরই লেখা। পেন-ফ্রেণ্ডের আশ্রয় নিয়ে জার্মানিতে এ ধরনের অনেক পারভারটেড চরিত্রের লোক দেখা দিয়েছে..বিগত যুদ্ধ এদের জীবনের আশা-আনন্দকে মুড়িয়ে দিয়ে গেছে, নতুন জীবনবোধের সঙ্গে এদের সামঞ্জস্য নেই, তাই অস্বাভাবিক ভাবে এরা পৃথিবী জুড়ে মাকড়সার ফাঁদ পেতেছে—

হিমানীশ চুপ করলেও ওর কণ্ঠস্বরের রেশ তখনও গমগম করছিল নিঃশব্দ ঘরটার মধ্যে। এই নিঃশব্দতা যেন আমাদেরই মনের প্রতীক। নির্বাণীতোষের জীবন-কাহিনীকে যে চূড়ান্ত পর্যায়ে টেনে নিয়ে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেছে হিমানীশ, তারপরে অনন্ত মৌন ছাড়া আর কী আছে!

নির্বাণীতোষের কাহিনী এখানেই শেষ হয় নি।—নিঃশব্দতা ভেঙে বলল হিমানীশ, এর পর যেদিনই গেছি সে, খোঁজ নিয়েছে বিশ্বনাথের চিঠি এসেছে কি না! যেদিন ডাকে বিশ্বনাথের চিঠি এল সেদিনও গিয়েছিলাম ওর হাসপাতালে, মিথ্যা বললাম, প্রবোধ দিলাম ওকে। হয়তো সারা জীবন ধরে মিথ্যাই বলে যেতে হত, কিন্তু তার আর দরকার হল না। এর দু-একদিন পরে নির্বাণীতোষের রিলিজ হওয়ার কথা। বাঁ ধারের পাঁজরার দুটো হাড় বাদ দিয়ে ঈষৎ কুঁজো হয়ে তখন হাসপাতালের মাঠে হেঁটে বেড়াবার অনুমতি পেয়েছে সে। ছাড়া পাবার আগের দিন রাত্রে বিদায় নেবার কালে হঠাৎ ডাকল নির্বাণী-তোষ। বলল, কাল ভোরের ট্রেনেই আমি মালদা রওনা হব। আর

কোনদিন দেখা হবে কি না জানি নে। শোন।—খোলা মাঠে তখন সোঁ-সোঁ করে হাওয়া বইছে, টিনের শেডের মাথায় চাঁদ,চাঁদের আলো পড়েছে নির্বাণাতোষের চোখে মুখে, কী করুণ পাণ্ডুর দেখাচ্ছে ওকে! বলল, শোন—বিশ্বনাথের চিঠি আমি পেয়েছি। হঠাৎ বাজ পড়লেও এত চমকাতাম না।—ডাঃ লাহিড়ীর কাছে আমি ঠিকানা চেয়ে লিখেছিলাম। আমি জানতাম—আমি জানতাম হিমানীশ—মিস-অ্যানি থাকুন বা না-থাকুন তাতে কী যায়-আসে? স্বপ্ন মিথ্যা বলেই তো এত সুন্দর—

হিমানীশ বলল, মালদার আমের কথা মনে পড়লেই আমার নির্বাণাতোষের কথা মনে পড়ে যায়। এখন এই মুহূর্তে নির্বাণাতোষ কী ভাবছে জানি না। আমের কথা নয় নিশ্চয়, ওর আমের বাগান বিক্রি হয়ে গিয়েছে।

শনিবারের চিঠি শ্রাবণ ১৩৬৪

ঘরনী

শনিবারের কলকাতাটা এত নিরর্থক আর কোনোদিন বোধ হয়নি গুরুচরণ পাকড়াশীর কাছে। আপিস-ফেরত বাড়ি ফেরার পথে নিত্যই গড়ের মাঠ পেরিয়ে আসতে হয়, আজ পেরোতে গিয়ে তার মনে হল সারা মনটাই গড়ের মাঠের মতো বিক্ত আর ধূসর হয়ে গেছে। অথচ, এমন যে হবে কাল সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার আগেও ভাবতে পারেনি। নিয়মমতো ছুটির পর আপিস থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে লাটসাহেবের বাড়ির পাশ দিয়ে কার্জন পার্ক বরাবর ধর্মতলার মোড়ে ধরেছে স্টেটবাস। এলিয়ট রোড, লোয়ার সারকুলার রোডের মোড়ে নেমে হন হন করে ফিরেছে বেনেপুকুর লেনে ওর বাসায়, ঘরের দরজা যতক্ষণ না ধাক্কা দিয়ে খুলেছে এবং খোলবার পর চৌকাঠ পার হয়ে ঘরে পা দিয়েও বিপর্যয়কর কিছু আশংকা করতে পারেনি। বিজলী বাতির খরচ বাঁচাবার প্রয়াসে রোজকার মতো ঘরের তেলের পিদিমটা জ্বলছিল, কাঁপছিল শিখার বিন্দুটা, আর তাকে ঘিরে কয়েকটা আলোর পোকার আরতি। শহরের কোলাহল আর মত্ততাকে ঘরের চৌকাঠের ওপার থেকে বিদায় করবার অদ্ভুত এক নির্জন প্রকৃতি এবং প্রতিভা দুইই ছিল কণকলতার। আপিসে মুখ বুজে কাজ করত গুরুচরণ এবং অতিবড় দুর্মুখ দত্তসাহেবও তার কাজের কোনো ত্রুটি কোনোদিন আবিষ্কার করতে পারেনি, বিদ্রোহ করবার যে কোনো দিন সাহস ছিল তাও নয়, ঝঞ্ঝাট এবং বিপত্তির লোনাজল কিছুতেই তার দুর্বল স্বাস্থ্যে খাপ খেত না। গুরুচরণ ভীরুপ্রকৃতির মানুষ, আর কণকলতা ছিল নির্জন স্বভাবের, এত নির্জনতা যে হালকা সুঁচের আওয়াজেও তার অস্তিত্বের জানান পাওয়া যেতনা। গুটিপোকার

মতোই আপন আচ্ছাদনের বৃত্তে সে ঘুরেছে, আর ঘুরতে ঘুরতে রেশমের পুরু আচ্ছাদনের তলায় তার অস্তিত্ব গেছে হারিয়ে। বিয়ের বছর ঘুরতে না ঘুরতে হাসপাতালে মরা ছেলে রেখে আবার আবার সংসারে ঢুকেছে এবং চারপাশের নির্জনতাকে তেমনিই অটুট রেখে তৃতীয় বছরে সবৎসা ফিরে এসেছে। জীবনের এত বৈচিত্র্যের মধ্যেও তার স্বাভাবিক স্থৈর্যে বিন্দুমাত্র চিড় ধরেনি।

গুরুচরণের ছিল পার্থিব সমস্ত কিছু সম্পর্কেই ভীরুতা। সবচেয়ে ভয় করত স্ত্রীর নিজস্ব স্বভাবকে। আর সেই ভয়টাই যে এত শীঘ্রি সত্যি হবে, কালকে বাসায় পা দিয়ে ঘণ্টা দুয়েক কেটে যাবার পরও সে বুঝতে পারেনি।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল গুরুচরণ। বাড়ি ফিরতে আর ইচ্ছে করে না। বাড়ি আর গড়ের মাঠ সব সমান। গড়ের মাঠে হাওয়া আছে, বাড়িতে দম বন্ধ হয়ে আসে। কিন্তু কোথায় যাবে সে? আপিস-ফেরত দু-একজন কেরানী-বন্ধু টালিগঞ্জের মাঠে ঘোড়া ধরতে গেছে, দু' একবার অনুরোধও করেছে গুরুচরণকে সংগী হতে। কিন্তু, সেই দুর্মর ভয়, যাবার আগেই ভাবতে শুরু করে ভয়ে শুকিয়ে গেছে অন্তরাত্মা, সাহসের হাওয়ার অভাবে ফাঁসা বেলুনের মতো চুপসে গেছে ইচ্ছাটা। কিন্তু, এখন মনে হচ্ছে গেলেই হত। আজকে বুকের ওপর থেকে ভয়ের ভারি পাথরটা ঠেলে ফেলে দিয়ে প্রগলভ মরীয়া হতে ইচ্ছে করছে।

আর কী আশ্চর্য, এসপ্লানেডের গুমটির আশেপাশে ঘুরপাক খাওয়া সেই মেয়েটা আজো তেমনি সুযোগের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। রোগা-রোগা, শ্যামাংগী, মুখে পুরু পাউডারের পালিশ, চোখে কাজলের গভীরতা, ঠোঁটে রঙ, হালকা সিফনের শাড়ি আর লাল ক্রেশ সিল্কের জামা। বাড়ি-ফেরার পথে রোজ এই মেয়েটাকে দেখে ভয়ে সর্বশরীর শিরশির করে উঠত গুরুচরণের, মেয়েদের প্রতি

পুরুষের সহজাত তাকানোর প্রবৃত্তিতে চোখ পড়ত রোজই, কিন্তু দৃষ্টিটা স্থায়ী হত না, তার আগেই লাফ দিয়ে বাসে বা ট্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ত।

সেই মেয়েটা! আজো দাঁড়িয়ে। আজকে আর এড়িয়ে যেতে ইচ্ছে করল না তার। বাড়ির কথা ভেবে, সেখানকার পরিস্থিতির কথা ভেবে হঠাৎ এই মেয়েটার মধ্যেই যেন সমস্যার সমাধানের ইংগিত খুঁজে পেল সে। আর, আজ কিছুতেই ভয় হল না মেয়েটাকে দেখে। আলুকাবলির ফেরিওলার সামনে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল গুরুচরণ। ভীরু পুরুষ-মানুষটাকে পলকে চিনে নিতে ভুল করল না মেয়েটি। হাসল। তারপর চোখের ইংগিত করে পিছন ফিরে সোজা এগিয়ে চলল সে। গুরুচরণ পিছু নিল তার। ট্রামের গুমটি ছাড়িয়ে হকার্স কর্নারের নির্জন দেয়ালের আবছা আঁধারের আড়ালে ছায়ার মতো মিলিয়ে গেল মেয়েটা। গুরুচরণও দাঁড়াল ওর মুখোমুখি। বুক ঢিপ ঢিপ করছে। গলার ভেতরটা শুকনো কাগজের মতো খশখশে! চোখদুটোও কেমন ঝা ঝা করছে। ফিশ ফিশ আলাপ, চাপা কণ্ঠস্বর, হাসি-তামাশা।

সুরেন বাঁড়ুজ্যে রোডের মোড়ে রিকশায় চাপল দুজন। সামনে পর্দাটা ফেলে দিয়ে রিকশাওলা ছুটে চলল। রিকশার গতিতে দোলা লাগছে শরীরে, পাশে বসা মেয়েটার সান্নিধ্যে ঝিমঝিম করছে রক্ত। শক্ত পাথরের মতো বসে থেকে ভয়কে ঠেলে ঠেলে সরাতে লাগল গুরুচরণ। মেয়েটা অবাক কৌতূহলে মানুষটার দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসছে। এ লাইনে নতুন বুঝি, লজ্জার আড় ভেঙে তাই বর্বর নখদন্ত উদ্যত হয়ে ওঠেনি। দেখা থাক, বাবুর কতক্ষণ এই সাধুপনা থাকে! প্রশ্রয় না দিয়ে অপেক্ষাই করবে সে। আর তাছাড়া তাড়াহুড়োর কি আছে! এক রাত্তিরের বায়না।

সুরেন বাঁড়ুজ্যে রোড ছাড়িয়ে, লোয়ার সারকুলার রোডের বরাবর,

তারপর বাঁয়ে। এ গলি সে গলি। মাথাতোলা দালান কোঠার অহংকারকে ব্যাহত করে গলিটা গিয়ে থেমেছে একসারি টিনের বস্তিপ্যাটার্ণের ঘরগুলির সামনে।

'এই রিকশা রোকো—'

রিকশার ভাড়া চুকিয়ে পাশাপাশি কয়কটা ঘর ছাড়িয়ে এবার একটা ঘরের সামনে দাঁড়াল গুরুচরণ। চাবি দিয়ে ঘরের তালা খুলল। দরজা খুলে যেতেই অন্ধকারের সঙ্গে একটা চাপা বদ্ধ হাওয়া হঠাৎ হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

'এ কোথায় নিয়ে এলেন আমাকে?' মেয়েটার গলায় প্রতিবাদ ধ্বনিয়ে উঠল।

গুরুচরণ বললে, 'কেন? এই তো আমার বাসা।'

'তাতো দেখতেই পাচ্ছি। আগে জানলে এতদূর আসতাম না।'

গুরুচরণ কোনো উত্তর না দিয়ে সুইচের বোতাম টিপল।

উজ্জ্বল আলোতে সারা ঘরটা চমকিত হয়ে উঠল। আর সেই আলোয় মেয়েটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল ঘরের চেহারাটা। দক্ষিণের জানলা ঘেঁসে তক্তপোশ, অগোছালো শয্যা, দেয়ালে পেরেক এঁটে ময়লা ধুতি, জামা আর দু' একখানা ছেঁড়া শাড়ি ব্লাউজ কোণের দিকে কালো তোরঙের ওপর গুচ্ছের কাঁথা, কাপড়ের ফালি, পুবের দিকে ছোট্ট জলচৌকি, লক্ষ্মীর পট, রামকৃষ্ণের ছবি, কিছু বাসিফল-নৈবেদ্য আর সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে সারা ঘরের মধ্যে কেমন এক শিশুর অস্তিত্বের উগ্র গন্ধ।

'আপনি, আপনি আমাকে কোথায় নিয়ে এলেন?' তীক্ষ্ণস্বরে চিৎকার করতে গিয়ে গলা নামিয়ে জিগ্যেস করল মেয়েটি।

গুরুচরণ বিকারহীন গলায় শুধু বললে, 'বোসো। আসছি।'

মেয়েটা পথ আটকে দাঁড়াল, 'না, বসব না। কোথায় পালাচ্ছেন আমাকে একলা রেখে। আপনি কেমনধারা মানুষ?'

গুরুচরণ হাসল, না দাঁত খিঁচোল! বললে, 'ভয় নেই। কিছু খাবার নিয়ে আসছি।'

'বয়ে গেছে আপনার খাবার খেতে। আপনি লোক সুবিধের নন। এসব, এসব কি ব্যাপার.....?'

কাঁপছিল মেয়েটি।

গুরুচরণ নিস্পৃহ গলায় বললে, 'কি?'

'এই লক্ষ্মীর পট, রামকৃষ্ণ, কাঁথা, শাড়ি.....'

গুরুচরণ বললে, 'ওসব কণকলতার.....'

মেয়েটি বললে, 'কণকলতা কে!'

'আমার স্ত্রী।'

'স্ত্রী! আপনি, আপনি বিবাহিত!' মেয়েটি উত্তেজনায় জ্বলতে লাগল।

গুরুচরণ বললে, 'হ্যাঁ—'

'আপনার স্ত্রী কোথায়?'

'মারা গেছে।' ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল গুরুচরণ।

'কি হয়েছিল?' সন্দেহ কিছুতেই দূর হতে চায় না মেয়েটার।

'কি হবে, কিছুই হয়নি...' অন্যমনস্কে জবাব দিল গুরুচরণ।

'কিছুই হয়নি!' আরো অবাক হল মেয়েটি। নাকি একটা পাগলের হাতেই আজ পড়ল সে। তার অভিজ্ঞতায় এমন ইতিহাস নেই।

তার ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টির সামনে দিয়ে গুরুচরণ বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। একলা নির্জন ঘরে গা ছমছম করতে লাগল তার। একবার ভাবল এই সুযোগে পালিয়ে যায়, এখনো এসপ্লানেডে পৌঁছোতে পারলে নতুন খদ্দেরের অভাব হবে না। কিন্তু! দরজার কাছে গিয়ে একবার টেনে দেখল। না, বাইরে থেকে শেকল তুলে দিয়েই গেছে মানুষটা। আরো ভয়ে আশংকায় মুখ শুকিয়ে এল মেয়েটার। ভীত ত্রস্ত জন্তুর মতো ঘরের ভেতরে তার দৃষ্টি ঘুরতে লাগল। সেই দড়িতে

শাড়ি-ব্লাউজ, লক্ষ্মীর পট, রামকৃষ্ণ, কাঁথা-ন্যাকড়া, আর সব ছাপিয়ে শিশুর অস্তিত্ববাহী একটা উগ্র তেজালো গন্ধ।

বাইরে খুট করে শব্দ হল।

চমকে উঠল মেয়েটি।

গুরুচরণ ঢুকল। কোলের কাছে গুঁড়িসুড়ি কাপড়ের পুঁটলি, ফ্যাকাসে দৃষ্টি, নির্বিকার ঔদাসীন্য। পুঁটলিটা মেঝের এককোণে অত্যন্ত যত্নে নামিয়ে রাখল সে। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে ধ্যানমগ্নই মনে হল বুঝি তাকে। একটু পরে উঠে এল গুরুচরণ। হাসল। বললে, 'একটু বোসো। খাবার নিয়ে আসি।'

খাবার! লোকটা কি পাগল নাকি! ওই তো পুঁটলি করে নিয়ে এসেছে খাবার।

'শুনুন—শুনছেন—'

মেয়েটির ডাকে ফিরে দাঁড়াল গুরুচরণ। ভোঁতা ভোঁতা চাউনি।

'শুনছেন—' মেয়েটি কাঁপছে উত্তেজনায়: 'ঢের হয়েছে। যথেষ্ট শিক্ষা দিলেন আমাকে। দয়া করে শুধু একটা রিকশা ডেকে দিন, আমি এখ্খুনি চলে যাব...'

গুরুচরণ হাসল শুধু। বললে, 'চলে যাবে! তাকি হয়। সারা-রাতেরই তো দাম দেবো আমি।'

'চাইনে, চাইনে আপনার টাকা। আপনার মতো লোকের কাছ থেকে টাকা নেবার প্রবৃত্তি নেই আমার। শুনছেন—আমাকে একটা রিকশা ডেকে দিন।'

গুরুচরণ আবার ফিরল। দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। দরজাটা এবারও শেকল তুলে দিয়ে যেতে ভোলেনি সে।

দম-ফুরানো লাটিমের মতো এবার ক্লান্ত হয়ে ধপ্ করে তক্তপোশের ওপরেই বসে পড়ল মেয়েটি। আয়নায় মুখ না দেখা গেলেও বেশ বুঝতে পারছে ঘামে এতক্ষণ পাউডারের চড়া পালিশ গলতে শুরু

করেছে, চোখে আর গালের রঙও ফিকে হয়েছে, বোধহয় আতংকেই। আবার সেই ঘর, চার দেয়াল, শাড়ি ব্লাউজ, তোরঙ, ছেঁড়া কাঁথা-ন্যাকড়া, লক্ষ্মীর পট, রামকৃষ্ণ, বাসি ফুল-নৈবেদ্য।

টিক টিক করে কোথা থেকে একটা টিকটিকি সাড়া দিল। ধড়মড়িয়ে সোজা হয়ে বসল মেয়েটি।

এত দেরি করছে কেন ফিরতে মানুষটা। নাকি বাইরে ওর দলবল আছে, ফন্দি করছে, মতলব ভাঁজছে। এমন অনেক ঘটনা তো শোনা যায়। তাই যদি হয়, কি নেবে তার কাছে? একরত্তি সোনা নেই গায়ে, সব ঝুটো পাথরের হগ্ সাহেবের বাজার থেকে কেনা।

ট্যাঁ—

কিসের শব্দ?

ট্যাঁ—ট্যাঁ—

কান খাড়া করে দম বন্ধ করে শব্দটাকে ধরবার চেষ্টা করল মেয়েটি। ভৌতিক ব্যাপার নাকি! না, শব্দটা ঘরের মধ্যে থেকেই আসছে। কৌতূহল আর আশংকা। উঠে দাঁড়াল সে। পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেল কোণের দিকে, যেখানে পুঁটলিটা সযত্নে নামিয়ে রেখেছিল গুরুচরণ।

আর. কী আশ্চর্য, নাকি স্বপ্ন, না সত্যি, না আরো কিছু, পুঁটলিটা সচল পদার্থের মত নড়ছে! তবে কোনো খাবার নয় এটা!

ট্যাঁ-ট্যাঁ—

নিজেরই অজান্তে কখন পুঁটলিটার কাছে বসে পড়েছে মেয়েটি। কাঁপা-হাতে পুঁটলির ঢাকনাটা সরিয়ে দিতে ভয়ে আঁতকে উঠল সে। ওমা গো, একি! একটা মানুষের বাচ্চা, মাস কয়েকও হয়নি বোধ হয়। হাত পা ছুঁড়ছে, কাঁদছে, কণ্ঠনালীতে অমানুষিক জোর। এতক্ষণ গুমরে গুমরে কাঁদছিল বাচ্চাটা, এবার মানুষের সাড়া পেয়ে তার নালিশের সুর আরো উচ্চগ্রামে বেজে উঠল।

নীরক্ত ফ্যাকাসে পাথরখণ্ডের মতো অনড় বসে রইল মেয়েটি। ঘরের মেঝের সঙ্গে পেরেক দিয়ে তার পা দুটো কে যেন এঁটে দিয়েছে! আর একটা নাম-না-জানা অব্যক্ত ভয়ে তার ভেতরটা হিমহিম হয়ে উঠল।

ট্যাঁ—ট্যাঁ—ট্যাঁ—ট্যাঁ—

কান্না থামবার নাম নেই।

লোকটা এত দেরি করছে কেন ফিরতে! সব কেমন ধোঁয়াটে, তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। কী কুক্ষণেই আজ মানুষটাকে দেখে সে হেসেছিল। বেঘোরে না প্রাণটা যায়। কটা বেজেছে কে জানে? সারা রাতের বায়না, সহজে কি ছাড়বে মানুষটা। কিন্তু কেঁদেই চলেছে বাচ্চাটা! কী হয়েছে? অসুখ, না কি খিদে পেয়েছে? কিন্তু বাচ্চাটা আসলে কার, কি পরিচয়? তবে, তবে কি মাস কয়েকের বাচ্চা রেখেই ওর মা, কণকলতা মারা গেছে। মনটা কেমন স্যাঁতসেতে হয়ে পড়ছে। হাত বাড়িয়ে ওকে একটু চুপ করাতে চেষ্টা করবে নাকি। একটু কোলে তুলে নিয়ে আদর করলে হয়তো-বা ঘুমিয়ে পড়তে পারে আবার।

হাত দুটো বাড়িয়েছিলও ঠিক, কিন্তু থেমে পড়ল। বাইরে দরজা খোলার শব্দে স্প্রিং-এর মতো লাফিয়ে উঠল মেয়েটি। হাতে ঠোঙ্গা নিয়ে ক্লান্ত পায়ে ঘরে ঢুকল গুরুচরণ।

মেয়েটি প্রাণপণ বেগে চিৎকার করে বললে, 'এ সবের মানে কি! আমাকে কেন এনেছেন?'

গুরুচরণ মৃদু হাসল। 'খুব চেঁচাচ্ছে বুঝি? মার কথা মনে পড়েছে নির্ঘাৎ। এখুনি চুপ করিয়ে দিচ্ছি—'

সচল পুঁটলিটাকে বুকের ওপর তুলে নিল সে। তারপর দোলাতে-দোলাতে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। টেনে টেনে জড়ানো গলায় যেমন করে কণকলতা ছেলেকে ঘুম পাড়াত সেই জ্ঞানই কাজে

লাগাবার চেষ্টা করল গুরুচরণ। কিন্তু, অবাধ্য ছেলে তার বাপকে অযোগ্য প্রমাণ করবেই। কান্না আর থামে না। কাঁদতে-কাঁদতে হেঁচকি তুলছে, কাঁপছে।

লজ্জা লজ্জা মুখ করে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে গুরুচরণ বললে, 'না। বাগ মানবে না মনে হচ্ছে। খিদে পেয়েছে। একটু ধরবে একে, দেখি ওর খাবারের কোনো ব্যবস্থা হয় কিনা।'

'আমি..মানে...কী আরম্ভ করলেন এসব। আপনি...কেমনধারা মানুষ, আগে জানলে...' বিড় বিড় করে আপন মনে বকতে-বকতে বাচ্চাটাকে আলগোছে ধরল মেয়েটি। বড্ড বিশ্রীভাবে কাঁদছে বাচ্চাটা, হেঁচকি তুলছে, কাশছে। একটু ঘন করেই বুকের উষ্ণ সান্নিধ্যে জড়িয়ে ধরল তাকে, গুণগুণ করে গান গাইবারও চেষ্টা করতে হল কয়েকবার। আর, পর্দার আড়ালে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেও ওর বাপ যা করবার স্পর্ধা করেনি, এই একরত্তি শিশুটি কিনা অতি সহজেই তার অধিকারের নিশানা উড়িয়ে দিল।

'কই হয়েছে আপনার?' মেয়েটি ঘাড় তুলে জিগ্যেস করল গুরুচরণকে।

'হ্যাঁ। হল বলে।'

স্পিরিট-ল্যাম্প ধরিয়েছে গুরুচরণ, ধকধক করে জ্বলছে আগুনটা। ষ্টীলের একটা বাটিতে গরমজল চাপিয়ে দিল এবার। তারপর মুখ ফিরিয়ে গুরুচরণ বললে, 'দুধ তো নেই। বাড়িতে বার্লি আছে, তাই করে দিচ্ছি—বাঃ তোমার কাছে তো দিব্যি রয়েছে!' তারপর বুদ্ধিমানের গলায় একটু থেমে বললে, 'এই বাচ্চারা বোধহয় মা চায় না. যে কোন মেয়ের কোল পেলেই ওদের পিপাসা মেটে...'

'আপনার কবিত্ব থাক। এই নিন আপনার বাচ্চা। ঘুমিয়ে পড়েছে। ও হরি! এইভাবে বুঝি বার্লি রান্না করে!' পুরুষের অপটুত্বের প্রতি মেয়েদের যে চিরকালীন করুণা, সেই আলোকে অদ্ভুত-বিহ্বল

দেখাল মেয়েটির চোখ মুখ, আর তার সামনে লজ্জায় হার-মানতে পেরে আর এক ধরণের তৃপ্তির সুখে নিশ্চিন্ত আর স্বার্থপর দেখাল গুরুচরণকে।

'নিন—একে শুইয়ে দিন—'

গুরুচরণ যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল! সন্তর্পণে শিশুকে কোলে নিয়ে মেঝের বিছানায় শুইয়ে দিল তাকে।

পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরাল গুরুচরণ। সিগারেট-টানার ফাঁকে-ফাঁকে দৃষ্টি রইল মেয়েটার ওপর। তার দিকে পেছন ফিরে মেঝের ওপর উবু হয়ে বসেছে সে। চামচের ঠুনঠুন শব্দ, বার্লি গুলছে। মেয়েটার দিকে চেয়ে-চেয়ে কেমন এক স্বপ্নের নেশা ঘনায় গুরুচরণের মনে। কতক্ষণ অন্যমনা হয়ে এইভাবে তাকিয়ে থাকত, কে জানে!

নারীকণ্ঠের ধমকে স্বপ্নজাল ছিঁড়ল, 'হাঁ করে কি দেখছেন? নিন——খাইয়ে দিন—'

'এ্যাঁ—হ্যাঁ এই যে—'

বার্লির বোতলটা ঘুমন্ত বাচ্চার মুখে গুঁজে দেবার চেষ্টা করল গুরুচরণ। কিন্তু আঠার মতো ছোট্ট ঠোঁটদুটো জুড়ে রয়েছে। দু' একবার মুখ বেঁকিয়ে খেতে অনিচ্ছাই জানাল বাচ্চাটা। যদিও অনুগ্রহ করে কয়েকবার টানবার চেষ্টা করল, কিন্তু ঘুমের আচ্ছন্নতার তলায় ডুবে গিয়ে টানবার সাধ্যও তার রইল না! গুরুচরণ ধৈর্যশীল মানুষ, কিন্তু ঘুমন্ত বাচ্চাকে খাওয়াবার সাধনায় মনে হল তার ধৈর্যও যেন হার মানছে।

মেয়েটা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মানুষটার কীর্তি দেখতে লাগল। যুগ যুগ ধরে বসে থাকলেও যে গুরুচরণ বাচ্চাকে খাওয়াতে পারবে না, সেটা বুঝতে তিল মাত্র দেরি হল না তার। কিন্তু, না, আর প্রশ্রয় দেবে না সে। যথেষ্ট বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে ইতিমধ্যে।

কটা বাজল ? সন্ধ্যা যে বহুক্ষণ উৎরে গেছে, বাইরের ঘন-হয়ে-আসা নির্জনতার মধ্যেই তা বোঝা যাচ্ছে।

'শুনছেন ?'

'উঁ ?'

'কটা বেজেছে বলুন তো—'

'নটা-দশটা হবে।' গুরুচরণ মুখ ফিরিয়ে বললে।

মাত্র নটা-দশটা ! এখনো রাত ভোর হতে অনেক বাকি। এখন ফেরা না-ফেরা সমান। তার চেয়ে এখানে, এই ঘরেই রাত কাটিয়ে দেয়া ভালো !

'এস, খাওয়া-দাওয়া করা যাক। খিদে পেয়েছে তো ?

হ্যাঁ। খিদেও পেয়েছে। কিন্তু শুকনো রুটি আর পাঞ্জাবী দোকানের মাংসের হাড় চিবোতে গিয়ে আজ কেমন খাওয়ার মতো প্রকাণ্ড সত্য জৈবিক তাড়নাটাও ফিকে জলো হয়ে আসে।

চর্বিভরা মাংসের টুকরোটা চিবোতে-চিবোতে একসময় গুরুচরণ জিগ্যেস করল : 'এ কি, খাচ্ছ না কেন ? কি ভাবছ এত ?'

নিরুত্তরে মাংসের হাড় নিয়ে অধিকতর মনোযোগী দেখা গেল মেয়েটাকে।

তক্তপোশে শুয়ে কাত হয়ে এবার আরাম করে সিগারেট ধরাল গুরুচরণ। পিছনের এক ফালি বারান্দা থেকে মুখ ধুয়ে আসতে দেরি করছে কেন মেয়েটা ! সারা দিনের মানসিক উৎপীড়নে দেহজুড়ে ক্লান্তি নেমেছিল গুরুচরণের। ভরা পেটে এল ঘুম-ঘুম আচ্ছন্নতা।

বোধহয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে পড়ল গুরুচরণ। আর হঠাৎ-জাগা আলোকে স্বপ্নের মতো দেখল মেয়েটাকে। মেঝেয় গোল হয়ে বসেছে, তার দিকে পেছন-ফেরা আধখানা মুখের আদল, জলের ছোঁয়ায় ধুয়ে মুছে গেছে পুরু পাউডারের প্রলেপ, খোঁপায়-গোঁজা টাটকা যুলের মালাটা আরো বাসি, শুকনো দেখাচ্ছে।

কোলের ওপর শুয়ে আছে বাচ্চাটা, আর, মুখে পুরে দিয়েছে বার্লির বোতলটা।

ভোরের দিকে যখন ঘুম ভাঙল গুরুচরণ দেখল মেঝেয় গুঁড়িসুড়ি মেরে অকাতরে নিদ্রা দিচ্ছে মেয়েটা, আর তার একটা হাত বেষ্টন করে রয়েছে বাচ্চাটাকে। ভোরের আলোকে রাত্রির রঙ ফিকে হয়ে যায়। রঙচঙে মানুষটাকে অনেক শাদা-মাটা স্বাভাবিক হয়ে উঠতে দেখা যায়। পাউডার-ধোয়া মেয়েটির মুখের বসন্ত বা ব্রণের বা মেচেতার কতগুলো বিশ্রী দাগ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, বোজা চোখের তলায় কাজলকে হার-মানা গাঢ় কালির দাগ,চোয়ালের আর কাঁধের হাড় দুটো বেমানান, আলতার প্রলেপের তলায় ফাটাফাটা পায়ের অস্তিত্বকে লুকোনো যাচ্ছে না। কণকলতা এর চেয়েও সুন্দর, আর নির্জন, হিম-হিম নির্জন, সাপের নির্মোকের মতো, সেই কণকলতা এমনটা করবে, এইভাবে...

ডাকতে গিয়েও ডাকতে পারল না, কেমন ইচ্ছে করল না তার। মনে হল : এই স্বপ্ন-সত্যের আবেশ-মাখা দৃশ্যটার ভেতরে কোথায় একটা সুখের বেদনা লুকিয়ে রয়েছে। নিঃশব্দে পাশ ফিরে এবার আরো নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে লাগল গুরুচরণ।

বাচ্চাটা কেঁদে উঠল। খুক খুক করে কাশছে। ঠাণ্ডা লেগেছে বোধহয়।

মেয়েটা জেগে উঠল। জেগে উঠেই প্রথম চোখ পড়ল তক্তপোশে উঠে বসা গুরুচরণের মুখের ওপর। কী ভাবল, হাসল। তারপর বিস্রস্ত বসন সামলে নিয়ে উঠে পড়ল।

'ইশ! সকাল হয়ে গেছে।' মেয়েটা হাই তুলে বললে, 'আমাকে তুলে দেননি কেন?'

'ঘুমোচ্ছিলে। তাই।' গুরুচরণ বললে।

'বা রে মানুষটা! আমি যদি সারা দুপুর ঘুমিয়ে থাকতুম, তাহলেও তুলে দিতেন না।'

'দিতাম হয়তো, আপিস যাবার আগে। সাতটা তো বাজল, আর কতক্ষণই-বা, নটায় আমার হাজিরা।' চায়ের জল চাপিয়ে দিয়ে বললে গুরুচরণ।

মেয়েটি বিদায় নেবার তোড়জোড় করতেই বোধহয় ভেতরের বারান্দায় চলে গেল।

বাচ্চাটা কাঁদতে শুরু করল। হাতপা ছুঁড়ে, আর কাশির শব্দ।

সেজেগুজে মেয়েটি ঘরে ফিরে এসে বললে, 'আমি যাই তবে।'

'এ্যাঁ!' গুরুচরণ চমকালো। 'চা খাবে না?'

'আমি চা খাইনে।'

'ও!' কেতলির জলটা ফুটছিল টগবগ টগবগ। অনেকক্ষণ সেদিকে চেয়ে রইল গুরুচরণ।

মেয়েটি বললে, 'বাচ্চাটার কাশি হয়েছে দেখছি। বুকে পিঠে সর্দি জমতে পারে।'

গুরুচরণ নিস্পৃহ গলায় বললে, 'আমার সময় কই? এখুনি আপিসে দৌড়োতে হবে। পাঁচির মা'র কাছে রেখে যাব—পুরনো ঘি মালিশ করে দেবে এখন।'

মেয়েটি অকারণে জ্বলে উঠল, 'কে না কে পাঁচির মা! সে আপনার ছেলের যত্ন নেবে কেন, কি দায় পড়েছে তার।'

গুরুচরণ বললে, 'দায় তো পাঁচির মার নয়, আমার। সত্যি, আর কতদিন দায় নেবে সে! এবার ঠিক করেছি—' একটু থেমে বললে আবার: 'কিছু আফিম কিনে রাখব, আফিম খাইয়ে ঘরে বন্ধ করে রেখে যাব...'

'আফিম!' মেয়েটা রাগে উত্তেজনায় জ্বলতে লাগল: 'আপনি—আপনি মানুষ না পশু!'

গুরুচরণ বললে, 'কণকলতাও তো মানুষ ছিল...তবে বাচ্চাকে ফেলে রেখে সে বাপের বাড়ির মনের মানুষের সঙ্গে পালাল কেন।'

'পালিয়েছে! তবে যে বললেন, মারা গেছে।'

'একই কথা।'

'আপনি ভয়ংকর মিথ্যেবাদী। ভেবেছিলাম ভালো মানুষ। কিন্তু এখন দেখছি আপনি সব পারেন, সব করতে পারেন। ভেবেছেন কি চন্দ্র সূর্য নেই, থানা পুলিশ নেই...'

'এই নাও তোমার টাকা...' গুরুচরণ হাত বাড়িয়ে নোট এগিয়ে দিল।

'টাকা! আপনি আমাকে টাকা দেখাচ্ছেন! লজ্জা করে না? ভেবেছেন টাকা দিয়ে সব কেনা যায়। আপনার টাকা দেখাবেন পাঁচির মাকে, আপনার ওই নরকের টাকা ছুঁতেও ঘেন্না করে।' তারপর ধপ করে মেয়েটা বসল বাচ্চাটার শিয়রের কাছে। 'এই আমি বসে রইলাম বাচ্চার কাছে, আসুক আপনার পাঁচির মা, আসুক কণকলতা, দেখি কি করে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে ওকে, কই নিয়ে আসুন আফিম, যান বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান আমার সুমুখ থেকে—'

হঠাৎ গুরুচরণকে বিস্মিত করে দিয়ে হুহু করে কেঁদে ফেলল মেয়েটা।

বিংশ শতাব্দী পৌষ ১৩৬৭

একটি বিমর্ষ কাহিনী

বিশ্বজিতের মৃত্যুভীতি তার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে প্রবাদের সৃষ্টি করেছিল। সমীরণের মুখে যখন প্রথম শুনলাম, বিশ্বাস করিনি। সমীরণের কথায় উচ্ছ্বাসের তোড়টুকু এত প্রবল যে আসল বস্তুটিরই খেই হারিয়ে যায়। এরপর যখন কথাটা ক্রমশ আরো বন্ধুচক্রের মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে ঘোরালো হয়ে উঠল তখন অবিশ্বাস করবার জোর আমারই ফুরিয়ে যেতে লাগল।

এ যুগে ভয় করবার এত বস্তু থাকতে মৃত্যুর মতো একটি পুরানো বিষয়কে যে বিশ্বজিতের মতো আধুনিকমনা কলেজেপড়া যুবক কি করে বেছে নিতে পারল সেইটেই আশ্চর্য। মৃত্যু তো জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি—ইচ্ছেয়-অনিচ্ছেয় তাকে স্বীকার করে নিতেই হবে। তারজন্যে তাকে ভয় করবার কি কারণ থাকতে পারে। আজকের পৃথিবীতে যখন ভয় করবার অজস্র উপাদান যুদ্ধ মহামারী-দুর্ভিক্ষের রূপ ধরে দরজায় হানা দিচ্ছে তখন মৃত্যুভীতি তুচ্ছ হয়ে যায়।

আরো দশজনের কথা জানি না। নিজের কথা বলতে পারি। কৈশোর কালটা কেটেছে আমার মৃত্যুর বুড়ি ছুঁয়ে ছুঁয়ে। আমার দশবছরে মা মরল শুধু পরের বছরে বাবাকে সংগে নিয়ে যাবার জন্যেই। মৃত্যুকে পাশ কাটিয়ে অনাথ জীবনটা উড়তে লাগল আস্তাকুঁড়ের এঁটো পাতার মতো আত্মীয়স্বজনের প্রেমহীন সংসারে গলগ্রহ হয়ে। আজো কি পারলাম নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে? উন্নাসিক অন্ধ অবজ্ঞাই কেবল চিরস্থায়ী রয়ে গেল।

কিন্তু আমার কথা থাক। বিশ্বজিতের কথাই ভাবছি।

প্রায় মাসতিনেক ধরে ওর সংগে দেখা সাক্ষাৎ নেই। শুনেছি কলকাতাতেই আছে। কয়েকদিন ওর বাসা থেকে ফিরে এসেছি। বাড়ি-ফেরার যেমন অসময় তেমনি নাওয়া-খাওয়ারও। ওর কাকিমাও ওর মতিগতি সম্পর্কে কোন সঠিক খবর দিতে পারলেন না।

সেদিন বিকেলে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। দেশবন্ধু পার্কের ধারে আমার এক ইণ্টারমিডিয়েট ছাত্রীকে পড়িয়ে দ্রুতপায়ে সারকুলার রোডের দিকে আসছিলাম। মোড় পেরিয়ে গাড়িবারান্দার নিচে পৌঁছতে না পৌঁছতেই ঝমঝম সুরে কোলাহল করে বৃষ্টি নামল। সংগে ছাতা ছিল না। তাই আটকা পড়লাম। কতক্ষণ ওই রকম দাঁড়িয়ে থেকে পাশের চায়ের দোকানে ঢুকে পড়লাম।

'কে? সুব্রত না?' কোণের বেঞ্চে থেকে কে ডেকে উঠল।

চোখ ফিরিয়ে দেখলাম বিশ্বজিৎ। হঠাৎ মনের ভেতরটা তুমুল আনন্দে হর্ষ করে উঠল। এতক্ষণকার এই ছাত্রী-ঠেলার বিরক্তিকর জ্বালা আর এই অসময়ে বৃষ্টির তোড়জোড়ে সমস্ত আপত্তি নিমেষে জল হয়ে গেল।

'বিশ্ব! তুই!' বিষন আনন্দে হোঁচট সামলে বললাম আমি।

'ভগবান তুমি যুগে যুগে ভূত পাঠায়েছ বারে বারে। তোকে দেখেই বোধকরি রবিঠাকুর এই কবিতা লিখে গেছেন—' সশব্দে হেসে উঠল বিশ্বজিৎ।

বিস্মিত আবেগে চেয়ে ছিলাম ওর দিকে। বিশ্বজিতের সংগে পরিচিত না হলে এতদিন আমার কাছে মানবচরিত্রের একটি দিকই আবৃত থাকত। বহুকাল পর্যন্ত আমার কেমন এক স্থবির ধারণা ছিল যে লোক কথায় বার্তায় উচ্ছল হাসিতে ফেটে পড়ে সে কখনো জীবনে গভীর গম্ভীর হতে পারে না। বিশ্বজিৎ আমার এ ধারণার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ। ওর বাইরের স্বভাবের সংগে ভেতরের মানুষটির কোন মিল নেই। সেই মানুষটি বড়ই নির্জন, নিঃসংগ আর দুর্বল।

বাইরের রঙটা ওর সিনিক হলেও দেখেছি ভেতরটা অত্যন্ত সেন্টি-মেন্ট্যাল। শীতের দেশে জীবজন্তুদের শরীর বাঁচাবার জন্যে যেমন লম্বা লম্বা লোমের আচ্ছাদন রয়েছে তেমনি স্বভাবদুর্বলতা ঢাকবার জন্যে এক-দল লোক সিনিকের বর্মে আত্মরক্ষা করতে চায়। বিশ্বজিৎ সেই ধাতের লোক।

ওর পাশে বসে বললাম: 'পুলিসের ভাষায় বলতে হয় তোমার গতিবিধি বড় সন্দেহজনক। তোমার স্বার্থপরতা সত্যিই দৃষ্টিকটু।'

বিশ্বজিৎ তার লম্বা চুলে আঙুল চালিয়ে দিয়ে সহাস্যে বললে, 'তাই নাকি? কোনটা সত্যি? সন্দেহজনক না স্বার্থপরতা?'

বললাম: 'দুটোই।'

বিশ্বজিৎ বললে, 'সন্দেহের কথাই যদি উঠল তা'হলে বলি: আমরা জীবনে সংশয়বাদী কে নই? আমাদের পাণ্ডিত্যের জাহাজের সংগে সংশয় গাধাবোটের মতোই পিছু ধাওয়া করে এসেছে। এই সংশয়বাদ বিংশ শতাব্দীর মস্ত বড় রোগ। আর স্বার্থপরতা? ওই অভিযোগের কারণ আমার কাছে স্পষ্ট নয়।'

অভিমানের সুরে বললাম: 'তোমার হয়তো আমাদেরকে প্রয়োজন নেই,কিন্তু আমাদের তো তোমাকে প্রয়োজন থাকতে পারে।'

বিশ্বজিৎ হো হো করে হেসে উঠল: 'Jupiter you are angry. You are wrong. আমি যে এখানে ছিলাম না মোটেই।'

'ছিলে না বলেই তো পৌঁছানোর খবরটা দেওয়া দরকার।'

বিশ্বজিতের চোখে হঠাৎ একটা শ্রান্ত ছায়া ঝিলিক দিয়ে উঠল। আমার হাত চেপে ধরে বললে, 'ক্ষমা কর—'

ক্ষমা না করে আমার উপায়ও ছিল না। যদিও ক্ষমা-চাওয়া মানে পুনরায় সেই অপরাধ করবার সময় নেয়া। বিশ্বজিতের উপর আমার বিশ্বাস আছে, বিশ্বাস নেই ওর স্বভাবের অস্থিরতাকে।

সহসা মনে পড়ে গেল ওর সম্বন্ধে সেই চমক লাগানো খবরটি। বললাম: 'কি সব শুনছি তোমার সম্পর্কে?'

বিশ্বজিৎ হাত নেড়ে নাটুকে ভঙ্গিতে বললে, 'গ্রাম্যবার্তা না শুনিবে না কহিবে কভু। তবু শুনি ঘটনাটি কি? অপরের আয়নায় নিজেকে দেখবার কুতূহল অসীম।'

বললাম: 'তুই নাকি মৃত্যুভীত হয়ে পড়েছিস, এ্যাঁ?'

সহসা এক নিমেষে বিশ্বজিতের মাথা থেকে পা পর্যন্ত সমস্ত চেহারা যেন বদলে গেল। একটা সুস্থ প্রাণময় লোক যে এক লহমায় এমন মুহ্যমান হয়ে পড়তে পারে, কল্পনাও করা যায় না। পুরো পাঁচ মিনিট স্তব্ধ অচঞ্চল বসে রইল সে ঘাড় গুঁজে। তারপর যখন মাথা তুলল দেখলাম বেদনায় টলটল করছে চোখ, থরথর করে কাঁপছে ওর ঠোঁট। আর ঘনঘন শক্ত করে চেপে ধরছে ওর হাতের মুঠো।

অবসন্ন শ্রান্ত গলায় বিশ্বজিৎ বললে, 'হ্যাঁ মৃত্যুভীতি। সত্যিই আমি মৃত্যুকে ভয় করি। আশ্চর্য হচ্ছিস। আচ্ছা মৃত্যু দেখেছিস তুই?'

মাথা নেড়ে জানালাম: 'দেখেছি।'

অদ্ভুত এক আবেগে উত্তেজনায় জ্বলতে লাগল বিশ্বজিতের চোখ। দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'না দেখিসনি।'

মানুষ এক-এক সময় এমন মরিয়া হয়ে উঠে যখন তার নিজের জেদই অহংকারী মত্ততায় ফুঁশে উঠে তখন তাকে বাধা দিতে যাওয়া নির্বোধের কাজ। তাই গভীর ধৈর্য আর স্থির গাম্ভীর্য নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

বাইরে তখনো গম্ভীর শব্দে বৃষ্টির হিংস্র ফোঁটা আছড়ে পড়ছে কালো পিচের উপর। অন্ধকার আকাশ। ট্রাম-বাসগুলি দ্রুত শব্দে ছুটে চলেছে।

বিশ্বজিতের গলার স্বর শোনা গেল: 'একটি গল্প বলি শোন্—'

'গল্প!'

'হ্যাঁ। গল্পও বলতে পারিস, নাটকও বলতে পারিস। একেবারে

পারিবারিক নাটক। আমার মাতুলালয়ের কাহিনী। জানিস তো তুই মাস দুয়েক আগে আমার মেজমামার ভীষণ অসুখের জরুরী তার পেয়ে মালদায় গিয়েছিলাম।'

বললাম: 'হ্যাঁ। তিনি তো মারা গেছেন।'

বিশ্বজিৎ বললে, 'মামার মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত না-থাকলে আজো হয়তো জানতে পারতাম না মৃত্যু জিনিসটি কি ভীষণ। মামার মৃত্যুর তিনটে দিন আগে পর্যন্ত আমি তাদের সংগে ছিলাম। দুপুরে আসাম লিঙ্কে মনিহারীঘাট বরাবর কাটিহার জংশন হয়ে পৌঁছলাম সন্ধ্যে নাগাদ। পরদিন সন্ধ্যার বিবর্ণ অন্ধকারে বাড়িতে ঢোকবার আগে মনটাকে শক্ত করে বেঁধে নিয়েছিলাম। দুখানি মাত্র ঘর—বারান্দার এক চালায় রান্নার ব্যবস্থা। একটি ঘর রোগশয্যা। ধীর পায়ে মামার বিছানার কাছে এসে দাঁড়ালাম। জীবনের ঘষাপাথরে ক্ষয়-হয়ে-যাওয়া রাগমসীঢালা শরীর। চেনাই যায়না মামাকে। আজো মনে পড়ে ছোটবেলায় কত বেত ভেঙেছেন তিনি আমাদের পিঠে।

মামা অস্পষ্ট চোখের তারায় আমাকে চেনবার চেষ্টা করে বললেন, 'কে? বিশু।'

মূক হয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম জানিনা। যখন চমক ফিরল দেখলাম ঘরটা কেমন বিশ্রী বোবা-ধরা থমথমে। খাটের পাশে চৌকিতে হেলান দিয়ে ক্লান্ত হাতপাখা থামিয়ে বসে রয়েছেন মামিমা। খোঁপা-ভাঙা মাথার পাতলা চুলের রাশ ঝুলছে কোমর বেয়ে, মাথার ঘোমটা স্খলিত। সিঁথির আর কপালের সিঁদুরের বিন্দুটিও তেমন জ্বলজ্বল করছে না। ঘরের মেঝেয় দরজার আনাচে-কানাচে পাঁচ-ছটি নাবালক ছেলেমেয়ে। উলংগ, বীভৎস। তাদের চোখে মুখে শূন্য অর্থহীন অভিব্যক্তি।

মামাতো ভাই প্রবাল আমাকে ডেকে নিয়ে গেল পাশের ঘরে। বললে, 'এস বসো—'

প্রবালকে কয়েক বছর দেখিনি। এই কয়েক বছরে অপরিষ্কার দাড়িগোঁফ ভর্তি রুক্ষ কঠোর মুখভাবে কেমন এক নিষ্ঠুর বিষাদের ছাপ পড়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ সে শুক্‌নো হেসে বললে, 'জানলে বিশুদা সবচেয়ে আমার খারাপ লাগে যখন ভাবি নিজের মূঢ়তার বীজ কেবলমাত্র বংশানুক্রমিক সূত্রেই অতীতকাল উত্তরকালের উপর দিয়ে যায়। এর মতো চরম অন্যায়, ভীষণ স্বার্থপরতা আর কিছুই নেই।'

থমকে থেমে ওর কথার অর্থের জন্য অন্ধকারে হাত পা ছুঁড়তে লাগলাম।

প্রবাল তেমনি নিস্পৃহ গলায় বলে চলল: 'সৃষ্টির কোন্ আদিম থেকে সৃষ্টিকর্তা মানুষের অন্ধকার গুহায় প্রবৃত্তির আগুন জ্বালিয়ে দিলে, সেই আগুনের যজ্ঞশালায় মানুষ নিজেকে পুড়িয়ে উড়িয়ে শেষ করে দিয়ে গেল। আমাদের পিতৃপুরুষের ক্ষণিক যৌনলীলার উত্তেজনা কেবল পরিণামে আমাদের ধ্বংসের ডাক শুনিয়ে চলে গেল।'

অন্ধকারে একটা ব্যাঙ লাফিয়ে পড়লে যেমন হয় তেমনি একটা ঝঙ্কারজনক অসুস্থ অনুভূতি ছাড়িয়ে গেল দেহের শোণিতে-শোণিতে। অন্য সময় হলে এই বি. এ. পাশ করা শিক্ষিত চাষাটির গালে সজোরে এক চড় বসিয়ে দিয়ে ওর বিকৃতির ভূত নামিয়ে দিতাম গা থেকে।

কিন্তু সে দিন সব কিছু ঘটনায় যতটা বিস্মিত হয়েছিলাম তার চেয়ে আহত হয়েছিলাম বেশি।

রাত্রে আর কোন ঘটনা নেই।

কোনোরকমে নাকেমুখে গুঁজে দুপুর রাত্রে মামার শিয়রের কাছে বসে মামিমাকে জোর করে পাঠিয়ে দিলাম ঘুমোবার জন্যে। নিস্তব্ধ রাত্রে নিদ্রিতপুরীতে জাগ্রত অতন্দ্র প্রহরী রইলাম শুধু আমি আর পাশের ঘরে প্রবাল। সে ম্যালথসের উপর মূল্যবান থিসিস লিখতে ব্যস্ত।

নিস্তব্ধ রাত্রির স্তব্ধতা চিরে জাপানী দেয়াল ঘড়িটি টকটক করে শব্দ করে চলেছে।

শয্যার উপরে নির্জীবের মতো মামার দেহখানা মৃত্যুর বিরুদ্ধে প্রতি মুহূর্তে জীবনের লালসা জানিয়ে ধুকধুক করে চলেছে। রোগে-কাতর গর্তে-ডোবা নিমেষহারা চোখ-দুটো ছাদের কড়িকাঠে কিসের গণনায় মত্ত। মাঝে মাঝে রোগের ধমকে ছটফট করে উঠছেন, মুখ থেকে জান্তবধ্বনি বেরিয়ে এসে মিশে যাচ্ছে ঘরের আনাচে কানাচে।

ভোর রাত্রির দিকে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম চেয়ারের বুকে মাথা রেখে। কি-রকম একটা বাইরে থেকে ভেসে আসা বিশ্রী গোলমালে ঘুম ভেঙে গেল।

চোখ রগড়াতে রগড়াতে বাইরের ঘরের দিকে উঠে এলাম।

প্রবালের সামনে চৌকিতে বসে একটি মেদবহুল স্ফীত লোক আপন মনে গজরাচ্ছে। আর প্রবাল তাকে নিচু গলায় কি বোঝাবার চেষ্টা করছে।

জিগ্যেস করলাম: 'ইনি কে প্রবাল?'

প্রবাল উদাস গলায় বললে, 'বাড়িঅলা। চারমাসের ভাড়ার মৃগয়ায় বেরিয়েছেন। তাঁকে অনেকবার বোঝাবার চেষ্টা করে হয়রাণ হয়ে গেলাম যে বাবার কিছুদিন থেকে বাড়াবাড়ি অসুখ।'

বাড়িঅলা বিশ্রী সুরে কথার মাঝে বলে উঠলেন, 'ওসব বুজরুকি বহু শুনেছি মশায়। তাগাদায় এলে ভাড়াটেদের ওইরকম অসুখ হামেশাই হয়ে থাকে। আমার আজই ভাড়া চাই—চারমাসের দেড়শো টাকা।'

লোকটির কথাবার্তার ধরণে আমার মতো নিরীহ মানুষের রক্তও গরম হয়ে ওঠে। কিন্তু এক্ষেত্রে রাগারাগি করেও কোনো ফল হবে না, বুঝতে পেরেছিলাম। তাই আমিও নরম হয়ে বললাম, 'দেখুন—সত্যিই মামার কঠিন অসুখ।'

বাড়িঅলা ব্যংগ করে উঠলেন, 'তুমি কে হে বটে!

সেই যে কথায় বলে না ছুঁচোর গোলাম চামচিকে!'

'শাট্ আপ। আপনি এই মুহূর্তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবেন কিনা বলুন?'

'বটে! আমাকে অপমান! আমি আদালতে যাব—আমি মানহানির নালিশ করব। খুব যে চোখ রাঙিয়ে কথা হচ্ছে। বলি: মামাটি পটল তুললে বাড়িভাড়া কে দেবে, শুনি? না স্বগ্‌গে গিয়ে নালিশ ঠুকব? অ্যাঁ?'

'আপনার যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন। যান. এখুনি বেরিয়ে যান—'

'তাই যাচ্ছি—' ছাতা বগলে বাড়িঅলা প্রস্থান করলেন।

তক্তপোশে মুখ ঢেকে প্রবাল পাথরের মতো বসেছিল। আমি ওর হাত চেপে ধরতে থরথরিয়ে কেঁপে উঠল তারপর নিজেকে সংযত করে হাসির করুণ অভিনয় করে বললে, 'শরীরটা কিরকম করে উঠেছিল।'

আমি চুপ করে রইলাম।

প্রবাল তেমান নাকউঁচুচঙে বললে, 'এই বুড়ো পৃথিবীটা কেমন ভেঙে চুরে শেষ হয়ে গেছে বিশুদা। মানুষগুলো সব নেঙটি ইঁদুর হয়ে গেছে। বাড়িঅলাকে একা দোষ দিয়ে লাভ নেই।'

রোগার ঘর থেকে মামিমার অস্ফুট কান্নার আওয়াজে চমকে উঠে দুজনে ছুটে গেলাম।

শ্বাসকষ্ট হচ্ছে রোগীর। নাড়ী খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

'প্রবাল ভাই—এখুনি একটা ডাক্তার...'

প্রবাল ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

স্বাভাবিক বুদ্ধি মতো পায়ে হট্ কম্প্রেস করতে লাগলাম। কয়েক মিনিট পরে আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে এল রোগীর অবস্থা। মন্দগতি

নাড়ীর সঞ্চালন অনুভূত হতে লাগল। মামা চোখ খুলে আবার একদৃষ্টে তাকাতে লাগলেন মাথার কড়িকাঠের দিকে।

মামিমাকে বাতাস করতে বলে বেরিয়ে এলাম। এতক্ষণকার শ্বাসরোধী আবহাওয়া থেকে যেন কিছুটা মুক্তির আরাম পেলাম।

একটু পরে প্রবাল ফিরল একা।

'ডাক্তার এলেন না?'

'না।'

'কেন?'

'বললেন, আসতে পারবেন না। বাবা নাকি কবে ডাক্তারের বিপক্ষে একটি পুলিশ কেসে সাক্ষী দিয়েছিলেন। এবার প্রতিশোধ নেবেন ডাক্তার।'

রেগে বললাম: 'শহরে কি আর ডাক্তার নেই?'

প্রবাল বললে, 'যাঁরা আছেন তাঁদের আনতে রিকশাঅলাকেই আড়াই টাকা দিতে হয়। বাহনের পরে আসল দেবতার প্রণামী আট টাকা।'

'টাকার অভাবে ডাক্তার আসবে না?' বিস্মিত হয়ে উঠি।

'আসছে না সেইটেই তো সত্য।'

বিরক্ত গলায় বললাম: 'তোর কথার ওস্তাদি রাখ। টাকা জোগাড় করতে হবে।'

প্রবাল বললে, 'মা'র অবশিষ্ট চারগাছা সোনার চুড়ি নিয়ে গিয়েছিলাম বেচবার জন্যে। ওতে নাকি একরত্তিও সোনা নেই, গিল্‌টি। সুখের সময় বাবা যা একদিন মা'র হাতে তুলে দিয়েছিলেন এবং যা একদিন মা সোনা বলেই চিনে এসেছিলেন, তা আজ মিথ্যে, ফাঁকি হয়ে গেল।'

হাত থেকে আমার ঘড়িটা খুলে দিয়ে বললাম: 'যা এটা নিয়ে যা। ডাক্তার আনা চাইই।'

প্রবাল বললে, 'আমি তা পারব না বিশুদা। আমাকে ক্ষমা করো—'

'ইডিয়ট—' জামা গায়ে বেরিয়ে পড়লাম বাসা থেকে।

দুপুর ঝাঁঝাঁ রোদে ডাক্তারকে নিয়ে ফিরলাম ঘণ্টাখানেক বাদে।

স্বকীয় ব্যবসাসুলভ উঁচুদরের গাম্ভীর্যে মনোযোগ দিয়ে রোগীকে পরীক্ষা করলেন ডাক্তার। মোটা লাইত্রেরী ফ্রেমের চশমায় আর মোটা পুরু ঠোঁটের দৃঢ়তার কঠিন আবরণ ভেদ করে আমার পক্ষে কিছু বুঝে-ওঠাই অসম্ভব ছিল।

হঠাৎ চেয়ারে পিঠ রেখে প্যান্ট-পরা পাদুটোকে বিস্তারিত করে দিয়ে ডাক্তার আমার দিকে ফিরে অনেকক্ষণ মৌন হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'আপনারা মানুষ না কশাই?'

এ প্রশ্নের কোন উত্তর ছিল না। তাই চুপ করে রইলাম।

ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন। 'চলুন—বাইরের ঘরে গিয়ে বসি—'

একটা লম্বাচওড়া ব্যবস্থাপত্র দিয়ে পকেটে টাকা গুঁজে ডাক্তার প্রস্থান করলেন।

'এবার?' টেবিলে চাপা-দেয়া ব্যবস্থাপত্রটি হাওয়া লেগে পত্‌পত্‌ করে উড়ছিল। তার দিকে শূন্যদৃষ্টিতে প্রশ্ন করল প্রবাল: 'এবার?'

পকেটে এখনো ঘড়ি-বেচা উচ্ছিষ্ট কয়েকটি টাকা পড়ে ছিল বা'র করে প্রবালের হাতে দিয়ে বললাম: 'ওষুধ নিয়ে আয়।'

'ওতে কি হবে? দেখছ না পনেরো মিনিট অন্তর ইনজেকশনেই তো ষাট সত্তর টাকার ধাক্কা। তারপর ফি ইনজেকশনে কম্পাউণ্ডারকে দিতে হবে দু'টাকা—'

মুখ কালো করে বললাম: 'ধার পাওয়া যায় না?'

প্রবাল হিমেল গলায় বললে, 'ধার জিনিসটা বড়লোকদের, গরিবদের একমাত্র পেটেণ্ট ব্যবস্থা ভিক্ষে—কিন্তু বাপ মরছে বলে কি এদেশে কেউ ভিক্ষে দেয়, না বিশ্বাস করে।'

'কিন্তু এইভাবে বিনা চিকিৎসায় মামা মারা যাবে!'

'যাবে, বিশুদা, যাবে।' অস্থির ভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠল প্রবাল।

স্থির নিবদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম ওর দাড়ি গোঁফে অপরিচ্ছন্ন রুক্ষকুটিল মুখের দিকে। ও হয়তো জানেনা তার নিজের কথাগুলির ওজন। ভালো করে উপলব্ধিও করতে পারে না অপরের উপর কি তার প্রতিক্রিয়া হয়। কিন্তু সেদিন যেন আমার মনে হচ্ছিল হয়তো প্রবালের দৃষ্টিভঙ্গিই ঠিক। অমনি করে সমস্ত নিষ্ঠুরতাকে ততোধিক নিষ্ঠুরতা দিয়ে ফিরিয়ে দিতে পারার মধ্যেই হয়তো টিঁকে থাকবার পথ আছে! বাস্তবের মুখোমুখি যদি দাঁড়াবার সামর্থ নাই-ই থাকে তা হলে পিঠ দিয়ে তাকে ঠেকিয়ে রাখাই ভালো।

কিন্তু একটা কিছু করতে হবে।

সারাটা দিন সম্ভব-অসম্ভব নানা জায়গায় কিছু টাকার জন্যে ঘুরলাম। প্রবালও ছিল আমার সংগে। কিন্তু ওর থাকা আর আমার থাকা আলাদা। প্রবাল সব জিনিসের চরম দিকটাই আগে থেকে তৈরি করে রাখে, তাই তার হাবভাব বিকারহীন। আমি জীবনে আশাবাদী, তাই আঘাত বেশি বাজে আমারই।

সেদিন সারা মালদা শহরটা—ওধারে অভিরামপুর আর এদিকে ফুলবাড়ি চষে বেড়ালাম। মামার উকিল কয়েকজন বন্ধু, কয়েকজন ছাত্রের অভিভাবক, পরিচিত আধা পরিচিত কেউই আমাদের অনুসন্ধান-তালিকা থেকে বাদ গেলেন না। রামকৃষ্ণ মিশনের ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে বোধহয় এরচেয়েও বেশি রোজগার হত!

'কেন এমন হল? জানো বিশুদা?' ক্লান্ত গলায় কি জানাতে চাইল সে।

প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে নাক তুলে চাইলাম ওর দিকে।

প্রবাল বললে, 'মরা ঘোড়ার পর কেউ বাজি রাখতে চায় না।

টাকা জমানোর মতো টাকা খরচ করাটাও মানুষের এক ধরণের নেশা। মদ ফুরিয়ে গেলে তারা খাঁটি নির্জলা মদই চায়, বলবে না শাদা জল নিয়ে এস।' একটু থেমে ঘন গলায় বললে, 'আর কেন তারা টাকা দেবে, বলো? আমার শিশু সন্তানের জন্মের সংগে আর একজনের বুড়ো বাপের মৃত্যুর কোনো সম্বন্ধ নেই।'

আশ্চর্য হয়ে বললাম: 'কিন্তু হৃদয় নামক তো একটা পদার্থ আছে আমাদের মধ্যে।'

প্রবাল বললে, 'ছেলে ভোলানো গল্প। আমার হৃদয় পরিবারের জন্যে, আমার ছেলেদের স্ত্রীর সুখের জন্যে। নিজের সুখকে খাটো করে অপরের জন্যে চিন্তা করার কাজটা হৃদয় করেনা, করে মস্তিষ্ক। নইলে হৃদয় বস্তুটির মতো স্বার্থপর অন্ধ জিনিস আর নেই।'

ওর সংগে তর্ক করবার মেজাজ ছিল না। সারাদিনের উত্তেজনায় আর শ্রান্তিতে দেহমনে একটা নোঙরা অসুস্থতা বোধ করছিলাম।

ডাক্তারখানায় গিয়ে জোড়াতালি দিয়ে আশু দরকারী ওষুধ নিয়ে কম্পাউণ্ডারকে দিয়ে মামাকে ইনজেকশন করা হল।

মামার মৃত্যুর শেষ দিনটির কথা কিছুতেই বিস্মৃত হতে পারব না। একটি চরম দুঃখী লোকের সারা জীবনের দুঃখের যোগফল করলেও বোধ করি তার পরিমাণ এত বৃহৎ হবে না

শীতের শীর্ণ নদীর মন্দা স্রোতের ক্লান্তিতে সন্ধ্যা নামল।

তৃতীয়বার ইনজেকশন দিয়ে এইমাত্র বিদায় নিয়ে গেলেন কম্পাউণ্ডার। রোগশয্যায় সাবিত্রীর তপস্যায় নিশ্চল বসে আছেন মামিমা। হাতের তালপাখাটা যন্ত্রের চালেই সঞ্চারিত হয়ে চলেছে। আশ্চর্য মামিমার সহ্যশক্তি, তুলনায় অহল্যাকেও যেন হার মানায়। এমনিই বোধহয় মানুষ! দিনের পর দিনের বিরামহীন ঘষা খেতে-

খেতে পাথরটা একসময় বুঝি এমনি করে শীতল, হিম, অনুভূতিরহিতই হয়ে পড়ে।

তার চেয়েও আশ্চর্য করে দিল ছোট ছোট দিগম্বর অপুষ্ট ছেলে-মেয়েগুলি। পৃথিবীর আলোকের সংগে-সংগে তারা বিধাতাপুরুষের অভিশাপ বয়ে নিয়ে এসেছে। শৈশবের একটি দিনও তারা সুখের সূর্যোদয় দেখেনি, কেটেছে মেঘলা স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘুপচিতে। অন্ধকারের বিষ তাদের মজ্জায় মজ্জায় মিশে গেছে। কোনোদিন হয়তা স্বপ্ন দেখে কেঁদে কঁকিয়ে উঠেছে, কিন্তু বাস্তবের আকাশে ডানা মেলতে পারেনি। ওদের ছোট ছোট চোখের তারায় আমি কোন জীবনের চাঞ্চল্য খুঁজে পেলাম না। ওরা হয়তো বাবার অস্তিত্বের মানে ভালো করে বুঝতে পারেনি। বাবা বর্তমানেও তারা যে দুঃখকষ্টের কাদায় হামাগুড়ি দিচ্ছে, তাঁর অবর্তমানে এর চেয়ে আর কত বেশি কষ্ট আসতে পারে তার হিসেব তাদের নাগালের বাইরে।

রোগীর গলায় এক দাগ মিক্‌শ্চার ঢেলে দিয়ে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

প্রবাল মনোযোগ দিয়ে কি একটা ইংরেজি কেতাব পড়ছিল।

'কি বই ওটা?' জিজ্ঞেস করলাম।

প্রবাল বললে, 'শার্লক হোমস্—'

ওর ডিটেকটিভ পড়া কৃত্রিম মনোযোগটা লক্ষ্য করছিলাম চুপ করে।

'আজকে আর খাওয়াদাওয়ার পাট নেই কিন্তু...' বইএর পাতাতে চোখ ডুবিয়েই জানাল প্রবাল।

বললাম: 'খাওয়ার ইচ্ছে নেই—'

'তাই নাকি?' প্রবাল বললে: 'আসল ব্যাপার কি জানো? ভাঁড়ারে মা ভবানী...'

আমি চুপ করে রইলাম।

প্রবাল আবার মলিন হেসে বললে, 'এই অভিজ্ঞতায় অবশ্যি নতুনত্ব নেই এতটুকু। খেতে না পাওয়ার চেয়ে খেতে-পাওয়াতেই আমাদের চমক বেশি।' একটু থেমে হঠাৎ তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করে উঠল: 'আচ্ছা বিশুদা, বলতে পারো, ছোট ছোট ভাইবোনেরা পর্যন্ত খেতে না-পেয়ে কেমন করে চুপ করে থাকে!'

বললাম: 'ওরা যে বুঝতে পেরেছে ভাই—'

প্রবাল বললে, 'ওরা যদি একটু কম বুঝত, যদি একটু চিৎকার করে কাঁদত তাহলেও এত বিশ্রী লাগত না!'

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পথের ধারের মাঠটার বুকে পায়চারি করতে লাগলাম।

আকাশে মেঘের নীরব সঞ্চার। কালো-কুটিল আকাশপট। ওপারের আমগাছের ঘন বনটা অন্ধকারের কালি মেখে স্তম্ভিত।

আজ আর ঘুম নেই চোখে। আজকে জেগে-থাকার রাত। সারা দিনের শ্রান্তিতে স্নায়ুকেন্দ্রগুলি ঝিমঝিম করছে।

পেছন ফিরে প্রেতায়িত অন্ধকার জোড়া বাড়িটির দিকে অপলক চেয়ে রইলাম। অদ্ভুত রহস্যময় দেখাচ্ছে বাড়িটির পরিবেশ। নিশ্চিন্তে জন্মাবার আর মরবার জন্যেই বোধহয় শিল্পী-মানুষের এই গৃহ-রচনার কল্পনা।

'কে?'

'আমি।' প্রবাল বললে, 'আজ বেজায় গরম, না?'

বললাম: 'হুঁ...'

'আচ্ছা বিশুদা, বি. টি. পড়তে কত খরচ লাগবে, বলতে পারো?'

'না।'

'কলকাতায় থাকবার কোনো ব্যবস্থা হতে পারে?'

বললাম: 'চেষ্টা করে দেখব—'

একটুও ভালো লাগছিল না প্রবালের এই ধরণের কথাবার্তা।

উদ্বেগাকুল বিষাদ পরিবেশের সংগে খাপ খাচ্ছিল না ওর চিন্তাধারা। আমার চিন্তা আটকে পড়েছে এখনকার এই রূঢ় বাস্তবের চাকায়। প্রবালের এই পাশ কাটিয়ে যাওয়া আর-এক ভবিষ্যতের পরিকল্পনা সময়োপযোগী ঠেকছিল না।

মামাকে আর এক দফা ওষুধ খাওয়াতে গেলাম। মামিমা তেমনি করে পাখা চালিয়ে যাচ্ছেন। ছেলেমেয়েরা কেউ কেউ মেঝের উপরেই নেতিয়ে পড়েছে ঘুমে আর অবসাদে।

মামিমা বললেন, 'তোরা এখন ঘুমিয়ে নে। মাঝ রাত্রে জাগিয়ে দেবো তোদের।'

বললাম: 'ঘুম আসছে না মামিমা--'

'একটু বিশ্রাম করে নে বাবা। আরো কত রাত জেগে থাকতে হবে, কে জানে।'

'আচ্ছা।'

প্রবালের বিছানার উপর ক্লান্ত শরীরটাকে গড়িয়ে দিলাম।

মাঝরাত্রে হঠাৎ বিশ্রী স্বপ্নে ঘুম ভেঙে গেল।

'মামিমা!'

মামিমা বললেন ফিশ ফিশ করে: 'ছাখতো বিশু তোর মামা কেমন করছেন--'

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম রোগীর ঘরে।

ধীরে ধীরে মুখ হাঁ করে দম নিচ্ছেন মামা। চোখের পলক স্থির। নাড়ীর গতিও অতি মন্দা। মুখ থেকে কেমন একটা চাপা আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। আমাকে দেখে কিছু বলতে চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু বেরুল না গলার ভেতর থেকে কোনো স্বর।

মৃত্যুর রূপকে সেই মুহূর্তে চিনতে ভুল হল না।

নিজের ভেতরের অসহ্য যন্ত্রণাকে অতিকষ্টে চেপে রেখে জিজ্ঞেস করলাম: 'প্রবাল কোথায়?'

মামিমা বললেন, 'ও ডাক্তার ডাকতে গেছে।'

কয়েকটি উদ্বেগজড়িত মিনিট কেটে গেল। প্রবাল এত দেরি করছে কেন ফিরতে। বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। হয়তো দেখতে পাব একটা রিকশা ডাক্তারের সংগে ছুটে আসছে প্রবাল।

কিন্তু, ল্যাম্প পোস্টের গায়ে হেলান দিয়ে ও কে দাঁড়িয়ে।

'প্রবাল!'

'হ্যাঁ। ডাক্তার ডাকতে আমি যাইনি বিশুদা। আমি লুকিয়ে আছি এখানে…'

'কিন্তু…'

'তুমি যাও, তুমি ভেতরে যাও বিশুদা। ওদের একটা আশাও অন্তত দাও যে ডাক্তার আসছে, আসবে, সব ভালো হয়ে যাবে।'

'ওটা তো মিথ্যে কথা।'

প্রবালের চোখ জ্বলে উঠল: 'মিথ্যা কি শুধু ওইটুকুই! আগাগোড়া সবটাই তো মিথ্যে। না না তুমি যাও বিশুদা। অন্তত একটা সান্ত্বনাও তাদের থাকবে যে ডাক্তার না-আসার জন্যেই বাবা বাঁচলেন না!'

আমি ভেতরে ছুটে যাবার কয়েক মিনিট পরেই মামা মারা গেলেন…'

বিশ্বজিৎ আবার আরম্ভ করতে যাচ্ছিল তার আগেই রেস্তুরেন্টের কর্তা এসে বললে, 'দাদা, রাত হয়েছে। দোকান বন্ধ করতে হবে।'

দুজনেরই চমক ফিরল। বাইরে বৃষ্টি থেমে গেছে। আমার ঘড়িতে চেয়ে দেখলাম রাত দশটা।

বিশ্বজিৎ আবার সামনের তাল তাল অন্ধকারের দিকে দৃষ্টি ছুঁড়ে বললে, 'তোমরা ঠিকই বলেছ সুব্রত। আমি মৃত্যুকে ভয় করি। এত ভয় কেউ কোনদিন করেনি, বলতে বলতে থরথর করে কাঁপতে লাগল ওর গলার স্বর যেমন করে হাওয়া লেগে কাঁপতে থাকে দেওদার পাতা।

রাতের সব তারাই

বাড়ির গায়ে-আঁটা নাম্বারপ্লেটের সঙ্গে দরখাস্তটা আবার মিলিয়ে নিলাম। তারপর কলিং বেলের বোতামে আঙুল রাখলাম। শব্দের তরঙ্গ কাঁপতে কাঁপতে মিলিয়ে যাবার আগেই দরজা খুলল। 'কাকে চাই?'

জুতোর নাকের ডগায় কাদা লেগেছিল সেটা ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টায় বোধহয় বেশি মনোযোগী ছিলাম, মেয়েলী গলার আওয়াজে চমকে তাকালাম। আমি কবি নই, তবু সকালের তরুণ আলোকে মনে হল শিশিরধোয়া শিউলির গুচ্ছ। আর মনে হল যৌবনের সমস্ত ঐশ্বর্য বিস্তার করে সে যেন সামনের প্রবেশপথ, সমূহ জিজ্ঞাসাকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে।

মেয়েটি হাসল। আবার বললে, 'কাকে চাই?'

বললাম: 'সিমেন্টের পিটিশনের এনকোয়ারি করতে এসেছি -'

'আসুন। ভেতরে আসুন।'

আমাকে বসিয়ে রেখে মেয়েটি ভেতরে চলে গেল।

পড়ার টেবিল। রবীন্দ্রনাথের একটি পাথরের মূর্তি। ফুলদানিতে শুভ্রশুদ্ধ রজনীগন্ধা। প্রাচীন সাহিত্য।

'এই যে আমার মা—' মেয়েটি ফিরে এসে বললে।

নমস্কার করে চেয়ে রইলাম ভদ্রমহিলার দিকে। মেয়েদের বয়েস চেনার স্বাভাবিক প্রতিভা আমার নেই। তবে মনে হল আগে বলে না দিলে ওদের দুজনকে বোন বলে ভুল করবার যথেষ্ট অবকাশ ছিল।

বললাম: 'আমি এসেছি আপনাদের পিটিশনের এনকোয়ারি করতে।'

ভদ্রমহিলা হাসলেন। বললেন, 'তবু ভালো এতদিনে কাঞ্চন জঙ্ঘার ঘুম ভাঙল।'

'মানে?' আমার বিব্রত জিজ্ঞাসা।

'দেখুন না আপনাদের সাপ্লাই আপিসের কাণ্ড।' ভদ্রমহিলা বললেন: 'দু' বছর হল দরখাস্ত করেছি। না-এলেন কেউ এনকোয়ারি করতে না-পেলাম সিমেন্ট।'

হাসলাম। বললাম: 'এনকোয়ারি যখন হল তখন পরেরটা আশা করতে দোষ কি।'

ভদ্রমহিলা অনুরোধ করলেন। 'আসুন। দেখে যান নিজের চোখে।'

বললাম: 'দেখতে আমাকে হবেই। আমার কাজই সেটা।'

ভদ্রমহিলা ঘুরে ঘুরে দেখালেন। প্লাসটারিঙের কাজ বাকি, ছাদ তৈরি করতে পারছেন না। আর, আরো কতরকমের অসুবিধে দেখুন তো!

বললাম: 'দেখেছি। ঠিক আছে। ভালো করে সুপারিশ করে দেবো।'

বাইরের ঘরে ফিরে এসে আমার ডায়েরিতে যথাসম্ভব নোট রাখলাম। এবার উঠে দাঁড়ালাম।

মেয়েটি বললে, 'মা আপনাকে একটু বসতে বললেন।'

'কেন?'

'সেটা মাকে জিগ্যেস করবেন—'

হেসে বললাম: 'বসতে হবে কেন না-জেনে বসতে বলার অর্থ নেই।'

মেয়েটি আবার বললে, 'সে কথা মাকে বলবেন।'

'বলব।' ঘাড় ফিরিয়ে জিগ্যেস করলাম: 'আচ্ছা পিটিশনে যাঁর নাম লেখা রয়েছে—'

'জানি। চিত্রনিভা ঘোষ। আমার মা—'

'আর এই বইতে ' প্রাচীন সাহিত্য হাতে তুলে নিলাম। 'কান্তা ঘোষ, বি. এ. থার্ড ইয়ার—'

'হ্যাঁ। আমার নাম।' কান্তা ঠোঁট চেপে বললে, 'এই নামগুলোও বোধহয় আপনার রিপোর্টে কাজে লাগবে।'

'না না। তা নয়।' হো হো করে হেসে উঠলাম। বললাম: 'ব্যাপারটা কে জানেন। ভাষাকে শুদ্ধভাবে ব্যবহার করতে গেলে যেমন ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত সূত্র মুখস্থ করা দরকার তেমনি একদিনের আলাপ-পর্বে গেঁথে ফেলতে হয় কতগুলো ছোট্ট নামের মাধ্যমে। নামটা অনেকটা ভাবানুষঙ্গের কাজ করে। তাই না?'

কান্তা গম্ভীর হবার ভান করে বললে, 'আপনি লেখক হলেন না কেন। বেশ তো কথা বলতে পারেন।'

হেসে বললাম: 'লেখক নই সেটাই বা জানলেন কি করে?'

কান্তার গাম্ভীর্য ভঙ্গি বদলে গেল। 'আপনি লেখেন!'

'লেখেন কথাটা যেমন শ্রদ্ধার সঙ্গে ঘোষণা করছেন তেমন নয়। রবীন্দ্রনাথও 'লেখেন' আমিও 'লেখেন', ক্রিয়াপদ এক রকমের হলেও বিষয়টা মোটে এক জাতীয় নয়।'

চিত্রনিভা দেবী ঘরে ঢুকলেন। ধূমায়মান চা আর জলখাবার।

'আপনার দোর করিয়ে দিলাম।' হাসলেন ভদ্রমহিলা।

'তা করুন।' বললাম: 'কিন্তু এসব কি করেছেন? জানেন ওগুলি আমাদের গ্রহণ করতে নেই। পাপ।'

'আমি বলছি কোনো পাপ লাগবে না আপনার।'

'সব পাপই আপাত-প্রলোভন। দিন। কিন্তু এই শেষ। আর কোনোদিন দয়া করে আমাকে এমন অবস্থায় ফেলবেন না।'

'সে দেখা যাবে।'

'জানো মা—' কান্তা গুমরে মরছিল এতক্ষণ। 'ইনি—গল্প লেখেন।'

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম: 'আমার নাম অরুণপ্রকাশ মিত্র। ওর কথা ছেড়ে দিন।'

চিত্রনিভা বললেন, 'বা, ছেড়ে দেবো কেন। গল্প লেখা কি ছেড়ে দেয়ার জিনিস। একদিন আসুন না সময় করে। শোনা যাবে আপনার লেখার কথা। জানেন—' কেমন লজ্জার ঢেউয়ে কাঁপল ওঁর গলার স্বর: 'এক কালে আমিও লিখতাম কিনা।'

'তাই বুঝি? আসব। নিশ্চয়ই আসব।' হাত ঘড়ির দিকে চেয়ে বললাম: 'আমার আবার সকাল-সকাল আপিস যেতে হবে। নমস্কার।'

রাস্তায় নেমে মনে হল আমার বেরিয়ে-আসার রকমটা তেমন শোভন হয়নি। আমার স্বভাবের ভাবুকতার ফলেই বিষয়টা পথ চলতে-চলতে ভাববার চেষ্টা করলাম। কারণটি হয়তো এই হবে পরিবেশের নতুন স্বাদ ভালো লাগার একটা অগাধ অনুভূতি অজানতে আমার সত্তাকে গ্রাস করে ফেলছিল। সুখবোধও যে এক-এক সময় কত অসহ্য হতে পারে এই ঘটনা তার উদাহরণ। কিংবা এও হতে পারে—আমার কোয়ার্টারের দরজায় পা দিতে দিতে হঠাৎ-ই মনে পড়ল: প্রথম সাক্ষাতে দুটো যৌবন পরস্পরকে প্রবল প্রতিপক্ষ মনে করে, লড়ায়ের এক সুতীক্ষ্ণ হিংসা খরতর করে তোলে ইন্দ্রিয়-গ্রামকে। কিংবা—

গুরুতর কাজের চাপে ঘটনাটাকে ভোলবার চেষ্টায় জয়যুক্ত হয়েছি এমন যখন মনের অবস্থা তখন কান্তাই হঠাৎ একদিন গোলমাল করে দিল।

আপিসে সোজা আমার রুমেই পর্দা ঠেলে উত্তপ্ত মুখে হেঁটে এল সে। 'আধমণ কয়লায় কতদিন চলে? কোনোদিন রান্না করেছেন নিজে?' আমার নাকের সামনে কান্তা ছুঁড়ে দিল কথাগুলো।

'কী করা যাবে?' বললাম: 'এজেন্টদের ডিপোয় কয়লা থাকলে তো পাবেন। শহরে সাতটা কয়লার দোকান। তার মধ্যে দুটিতে সামান্য কয়লা রয়েছে।'

'তার মানে আপনি কিছু ব্যবস্থা করবেন না—'নাকের পাতা ফুলিয়ে বললে কান্তা।

'একটু বসুন। হাতের কাজটা সেরে নিই।' বললাম।

'বসে কি করব।' বলেও বসল কান্তা। 'বসলে কি কয়লা মিলবে।' হাতের কাজ সেরে উঠে দাঁড়ালাম। 'চলুন।'

রাস্তায় নেমে জিগ্যেস করলাম: 'আপিসে আসতে কে বলেছে?'

কান্তা বললে, 'কে আবার বলবে। আমি নিজেই এসেছি।'

বললাম: 'এলেনই যদি কণ্ট্রোলারের কাছে না গিয়ে আমার মতো একজন ইনস্পেক্টারের কাছে এলেন কেন।'

'বারে যাকে চিনি তাঁর কাছেই তো যেতে হবে।'

'তাহলে আমার কাছে এসেছিলেন আপিসে নয়।'

'জানিনে।' কান্তা মুখ ঘোরাল। 'মা আপনার কথা বলছিলেন। তারপর তো আর গেলেন না আমাদের বাড়ি।'

বললাম: 'আপিসে কয়লা আর বাড়িতে গেলে তো সিমেন্টের তাগাদা।'

'আপনি—আপনি ভালো লোক নন।' কান্তার রাগের গলা: 'কে চেয়েছে আপনার সিমেন্ট কে চেয়েছে কয়লা। চাইনে দিতে হবে না আপনাকে।'

'এত জোরে কথা বলা কি ভালো।' বললাম:'লোকে কি ভাববে।'

'ভাবুক।' লম্বা পা বাড়াল কান্তা।

এবার বাঁধরাস্তায় এসে পড়েছি দুজনে। দু ধারে কৃষ্ণচূড়ার মিছিল। আর যেদিকে তাকাও দিগন্তবিস্তারী ময়দানের শ্যামলিমা। প্রাণখোলা হাওয়ার বন্যা এখনো উদ্দাম হয় নি।

আমার থেকে কয়েক পা এগিয়ে কান্তার দীর্ঘ সুগঠিত দেহের ছন্দ লক্ষ্য করছিলাম। ওর চলমান দেহ যেন কথা কইতে পারে। ওর পিঠের ওপর অবাধ্য আঁচলটা বারবার নিশানের মতো উড়ছিল। বাড়ির চার দেয়ালে আটকে-থাকা কান্তার পরিচয়টুকু আজকের এই বিকেলের ধূসর আলোতে যেন সমগ্রতায় বিশদ হল। তারপর ওর সমস্ত দেহের অস্তিত্বটুকু আমার চোখের সামনে থেকে মুছে গিয়ে কয়েকটা রঙের তুলিতে উজ্জ্বল হয়ে রইল। সেই আলোতে আমি অবগাহন করলাম।

কান্তা হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে কি বলতে উদ্যত হয়েছিল হঠাৎ আমার চোখের দিকে চেয়ে বোধহয় রঙের কাঁপন দেখেই কেমন স্থির হয়ে গেল। তারপর চোখ নামিয়ে কোনোরকমে বললে, 'চলুন না আমাদের বাড়িতে মা খুব খুশি হবেন।'

বললাম: 'ভেবেছিলাম না যেয়ে পারা যায়।'

কান্তার গলায় খুশির হাওয়া। 'পারা যায় না?'

'আর যায় না।'

'মা যখন সিমেন্টের জন্যে তাগাদা করবেন?' কান্তা হাসল।

বললাম: 'তার আগেই যে আমি কয়লা হয়ে গেছি।'

সেদিন অনেক রাত করে ভোজনপর্ব চুকিয়ে আচ্ছন্নের মতো ফিরলাম ওদের বাড়ি থেকে। দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়েছিল কান্তা। বাইরে জ্যোৎস্না পাগল হয়ে গিয়েছিল। জ্যোৎস্নায়-ধোয়া কান্তার শরীরটা একখণ্ড লিরিক কবিতার মতো মনে হচ্ছিল। আর ওর চোখের তারায় ফসফরাসের মতো কি জ্বলছিল। 'আপনার রাত হয়ে

যাচ্ছে –' ঝাউগাছে লাগা নিশ্বাসের মতো শুনিয়েছিল ওর গলা। প্রথম দিনে ওর যে শরীরটা সমস্ত শাখাপ্রশাখা মেলে প্রবেশপথ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সেই শরীরটাই সেদিন রাত্রিতে গেটের গায়ে মাধবীলতার মতো মনে হয়েছিল, একটু একটু দুলছিল লতাটা। 'কবে আসছেন?' বলেছিল কান্তা। 'আসব। আমাকে আসতেই হবে।' বলেছিলাম অবরুদ্ধ গলায়।

ক্লান্ত দেহকে শয্যায় ছুঁড়ে সেদিন সারা রাত ঘুম হয় নি। যক্ষ্মারোগের অনুভূতির মতো অন্তঃশীল রক্তের ভেতরে প্রদাহ। ভালোবাসাকে মনে হয়েছিল মানুষের জীবনের এক স্বভাববিরুদ্ধ বস্তু, তাই শরীরে মনে বিক্ষোভের তরঙ্গ ফুটে ওঠে। অনিয়ম হলেই যেমন জ্বর হয় তেমনি প্রকৃতির বিরুদ্ধতায় ভালোবাসাও জ্বর আনে চেতনায়। সারা রাত জ্বলছিলাম, ঘোর-ঘোর আচ্ছন্নতা মস্তিষ্ককে বারবার আক্রমণ করছিল। এখন এই মুহূর্তে কান্তার কোনো স্মৃতি নয়, ওর অস্তিত্বের রঙ আমার নির্ঘুম চোখের ধোঁয়ায় লেপে-পুঁছে গেছে।

'কি ভাবছেন?' কান্তা জিগ্যেস করে।

পাখির পাখায় ক্লান্ত সন্ধ্যা ময়দানের বুকে পাতলা জাল বিছিয়ে দিয়েছে। মহানন্দার জল কালো শেলেটের মতো, নক্ষত্র জলের আয়নায় মুখ দেখছে। ওপারে ঝাপসা গাছপালা। যেন কোন শিল্পী সারাদিন ছবি এঁকে ব্যর্থ অবসিত, মুছে ফেলেছে ইজেল ধ্যাবড়া কালির মোচড় দিয়ে।

নিশ্বাস ফেলে বললাম: 'তোমাকে ভাবছি।'

'আমি আছি। তাও ভাবনা।'

'আছ বলেই তো ভাবনা।' বললাম।

'তাহলে আমি এলাম কেন?' কান্তা মৃদু গলায় বললে।

বললাম : 'ভাবনার বন্যা নামাতে। তোমার অস্তিত্বের সূর্য-কিরণে আমার ভাবনাগুলো যদি গলতে না পারে তাহলে আমি যে পাথর হয়ে যাব।'

'ভাবতে আপনি ভালোবাসেন।' কান্তা আমার আঙুলে ওর আঙুলগুলো জড়াল।

বললাম : 'ভালোবাসা যে সৃজনী-শিল্প। আর সৃষ্টির ধর্মই চিন্তা।'

কান্তার আঙুলগুলি আমার আঙুলে আশ্রয় খুঁজছিল। উদ্ভিদের গন্ধকে ছাড়িয়ে ওর শরীরের একটা অজানা সুবাস থেকে থেকে আমার মনকে উন্মনা করে তুলছিল। সে হয়তো জানে না ভালোবাসার অন্ধ গন্ধকে। আমার মনে হল ভালোবাসা একটা সুরভি এবং ওই সুরভিত অবস্থাকেই মানুষ ভালোবাসে।

'একেক সময় কি অদ্ভুত লাগে জীবনটা—'কান্তা বললে। 'কত সহজ সাধারণ ভাবে আপনি এলেন আমার জীবনে। আমি সেদিন কেঁদেছিলাম—'

'কেঁদেছিলে?'

'হ্যাঁ। হারতে-পারার সুখে।' আমার ঘড়ি-পরা হাতটা তুলে নিয়ে কানে রাখল কান্তা, ঘড়ির টিকটিক শুনল। 'আপনি হারেন নি?'

বললাম : 'পুরুষের হারার কথা বলতে নেই।'

'আহা।' মুখ ভ্যাঙাল কান্তা। 'বীরপুরুষ।'

'চলো। এবার ওঠা যাক।'

'একটু বসি।' কান্তা বললে, 'ভালো লাগে না বাড়িতে ফিরতে। ঘুম আসে না। সেদিন অনেক রাত্রে চমকে গিয়েছিলাম। দেখি মার মুখ আমার মুখের কাছে। কি দেখছেন মা আমার মুখে। আমার খুব ভয় করছিল।'

বললাম : 'ভয়! মাকে দেখে।'

নিশ্বাস ফেলে বললে কান্তা : 'মাকে আপনি চেনেন না।'

চিত্রনিভা দেবীকে অদ্ভুত লেগেছিল সেদিন সন্ধ্যায়। কান্তা সেদিন গিয়েছিল তার এক বন্ধুর বিয়ের নিমন্ত্রণে।

চলে আসছিলাম চিত্রনিভা আটকালেন।

'কান্তা না থাকলে বুঝি বসা চলে না?' ভদ্রমহিলা হাসলেন।

বসতে হল।

চা এল পুড়িং এল। তারপর লেখা আর লেখকজীবন নিয়ে আলোচনা।

'জানেন—' চিত্রনিভা বললেন, 'যারা জানে না তারা কান্তাকে আমার বোন বলে ভুল করে।'

কথাটা হয়তো সহজভাবেই বলেছিলেন তিনি। কিন্তু ওঁর কথার স্বরে কিংবা মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম না এটাকে তিনি কৃতিত্ব অথবা অগৌরব হিসেবে ধরেছেন।

হেসে বললাম : 'সত্যিই বাইরে থেকে বোঝা যায় না।'

চিত্রনিভা চোখের তারা নাচালেন। 'আমরা তিন বোন। আমিই বড়। আমার বোনদের যদি দেখেন চিনতে পারবেন না। আমার চেয়েও তাদের বয়স্ক দেখায়।'

বললাম : 'এটা আপনার মস্ত বড় ঐশ্বর্য।'

চিত্রনিভা আত্মপ্রত্যয়ের হাসি হাসলেন। 'ভালো কথা। আপনার গল্প পড়লাম কাগজে।'

'কেমন লাগল?'

চিত্রনিভা গম্ভীর হলেন। কি ভাবলেন। তারপর বললেন, 'মাতৃত্বকে আপনারা লেখকেরা অত্যন্ত বড় চোখে দেখেন। মেয়েদের জীবনে মা হওয়াটা কি সত্যিই কিছু গুরুতর ঘটনা?'

'কি বলছেন আপনি ?'

'আপনি অমন চমকালে আলোচনা করা যায় না। আলোচনা যখন করব খোলাখুলি ভাবেই করব।'

'বেশ তো করুন না।' বিব্রত গলায় বললাম।

চিত্রনিভা বললেন, 'মা হওয়ার কার্যকারণ আপনি জানেন। মেয়েদের শারীরিক গঠনই স্বাভাবিকভাবে সে কাজ করে।'

আকুল গলায় বললাম: 'শুধু কি শারীরিক, মানসিক বলে কিছু নেই ?'

চিত্রনিভা বললেন, 'সেটা ব্যক্তিবিশেষের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু তাকে সাধারণীকরণ ঠিক নয়।'

আমি কি বলতে যাচ্ছিলাম তার আগেই চিত্রনিভা কথা আরম্ভ করলেন: 'আমি জানি আপনি এবার কি বলবেন! কাস্তার কথা তো।' হাসলেন তিনি: 'আপনি সাহিত্যিক, অনেক কিছু জানেন জানা উচিত বলেই সাহস পাচ্ছি আপনাকে বলতে। দেখুন শারীরিক সুখ কথাটা স্বীকার করতে আমরা ভয় পাই। হয়তো আমাদের সৃষ্টিকর্তার মনেও সে ভয় ছিল। এমনি একটা চরম সুখের মুহূর্তে আমার অজানতেই জন্ম সম্ভব হয়েছে কাস্তার। সাধারণ নিয়মেই মাতৃত্বের লক্ষণ এসেছে আমার শরীরে। ওটা একটা বিশেষ সময়ের ঘটনা। সেই বিশেষ ঘটনাই মেয়েদের সম্পূর্ণ জীবন নয়। আপনারা সাহিত্যিকরা বড় বেশি ঘটা করে প্রচার করেছেন ব্যাপারটা।'

কতক্ষণ স্থানুর মতো বসেছিলাম জানিনা। একসময় জোর করে শরীরটা টেনে দাঁড় করালাম। ভারি লাগছে পাদুটো। 'চলি। হ্যাঁ শুনুন—আপনার সিমেন্ট-পারমিট রেজিস্টার্ড করে পাঠানো হয়েছে। দু-একদিনের মধ্যেই পেয়ে যাবেন আশা করছি।'

'ধন্যবাদ।' দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন চিত্রনিভা: 'পরশু আসুন না। আমার স্বামী আসছেন কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে। আলাপ

হবে। আর—' হাসলেন তিনি: 'অমনি দেখে যাবেন আমার সংসারের চেহারাটা।'

'সময় পেলে আসব।'

সেদিন বাড়ি ফিরে সমস্ত চেতনাকে কেমন অসাড় বোধ করছিলাম। চিত্রনিভা দেবীর কথাগুলো মনে পড়ছিল আর ওঁর মুখের চেহারাটা। বড় বেশি নিরাসক্ত বিজ্ঞানীর মতো দেখাচ্ছিল তাঁকে! কিন্তু এসব কথা আমার সঙ্গে আলোচনার করার অর্থ। শুধুই কি সাহিত্যিক এষণা! কান্তার কথাটা মনে পড়ল: 'আমার মাকে আপনি চেনেন না।' সত্যিই চিনি না, এখন মনে হল আমার। নিদ্রাভিভূত হবার আগের মুহূর্তে হঠাৎ ইস্পাতের মতো একটা চিন্তা ঝলসে উঠল আমার মগজে। তবে কি নিজের আলাদা অস্তিত্বকে বিশিষ্ট করে তুলতে চান তিনি আমার কাছে। যেন শুধু কান্তার মা বলে তাঁকে না জানি। কেন তিনি আমার চোখে অনন্যা নারী হতে চান।

এরপর থেকে ভদ্রমহিলাকে সযত্নে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করলাম। আমাদের দেখা-সাক্ষাতের স্থান এবং সময় তৈরি হল কান্তার বাইরে থাকার নির্দিষ্ট কালটুকুকে কেন্দ্র করে। নির্জন ময়দানের ছায়া-অন্ধকারে মহানন্দার তীরে ঘাসের শয্যায় আমাদের প্রেমের নকসী-কাঁথা বোনা চলল। দূরের পাল্লায় কোনোদিন গৌড়ে কি আদিনা মসজিদে গেলে চিত্রনিভা দেবীকে জানিয়েই যেতে হয়েছে। চিত্রনিভা সব জানতেন, বুঝতেন, তাঁর প্রশ্রয় না থাকলে আমাদের অবাধ মেলামেশায় ছেদ পড়ত!

কলেজ পালিয়ে দুপুর বেলা সেদিন আমার নির্জন কোয়ার্টারে ঠেলে উঠল কান্তা। বইখাতা ছুঁড়ে ফেলে দিল টেবিলে, জুতোর

ফিতে খুলল কি না-খুলল সটান বালিশে মাথা দিয়ে বিতত হয়ে পড়ল আমার বিছানায়। রোদে জ্বলে ওর গৌর মুখ লাল, চোখের কোলে, নাকের ডগায় ঘাম।

বললাম: 'কি ব্যাপার?'

'এলাম।' কান্তা বললে, যেন দুরূহ অংকের সমাধান করে ফেলেছে এমন বিজয়-গৌরবে।

'আমার আপিস যেতে হবে না?'

'যান না। কে বাধা দিচ্ছে।' কান্তা পায়ের গোড়ালি দিয়ে তক্তপোশের ওপর জোর পরীক্ষা করতে লাগল।

সিগারেট ধরিয়ে বসলাম ওর মাথার কাছে।

'কই গেলেন না?' কান্তা ভ্রূর ধনুক আঁকল।

'কই আর যেতে দিলে।' হেসে বললাম: 'ভীষণ ঘেমেছ। এই কড়া রোদে ছাতা নিয়ে বেরোও নি কেন?'

কান্তা সে কথার জবাব দেবার দরকার বোধ করল না। বড় বড় চোখ দিয়ে আমার ঘরটা পর্যবেক্ষণ করে পরে বললে, 'এমন অপরিচ্ছন্ন অগোছালো কেন ঘরের জিনিসপত্তর। আপনি ভয়ানক নোঙরা।'

গম্ভীর গলায় বললাম: 'ভাবছি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রস্তাব পাঠাব কম্যুনিটি প্রজেক্টের প্রথম পাঠটা যেন আমার এই ঘরেই হয়।'

বিস্মিত বিরক্ত কান্তা বললে, 'মানে?'

'মানে আর কি।' বললাম: 'ঘরদোর পরিষ্কার রাখার প্রথম পাঠটা নিতে গিয়ে ওরা আমার ঘরটাই পরিষ্কার করে ফেলবে।'

'ও ইয়ারকি হচ্ছে।'

ওর কানের কাছে চুলগুলো ঘসে দিয়ে বললাম: 'হ্যাঁ। হচ্ছে।'

'আঃ ছাড়ুন লাগে।' কান্তা তক্তপোশে শব্দ তুলে উঠে পড়ল। 'আপনি জল খান তো? না তেষ্টা পেলে বাইরের কলে খেয়ে আসেন।'

'ওইখানে কুঁজো আছে কুঁজোর গলায় গ্লাস—'

কান্তা জলের গ্লাস হাতে নিয়েই চেঁচিয়ে উঠল : 'এই গ্লাসে জল খান। এই, এই নোঙরা গ্লাসে। আপনার চাকরটা কি করে। সাবান দিয়ে ধুয়ে দিতে পারে না ?'

বললাম : 'মনিবকে চিনে ফেলেছে। ফাঁকি দিচ্ছে।'

জল খাওয়া হল না কান্তার। বললে, 'সাবান কোথায় ?'

সাবান বের করে গ্লাস ধুলো সে। জল খেতে ভুলে গেল। তারপর ময়লা জামাকাপড়গুলো ডাঁই করে রাখা তোরঙের ওপর, দেখল কান্তা। বইপত্তরগুলো জানালার নিচে সারাদিন দামাল শিশুর মতো দস্যিপনা করে তেমনি ভাবেই ঘুমিয়ে পড়েছে। স্টোভের গায়ে জুতোর একপাটি আর একটা দরজার পাশে। তাও দেখল কান্তা। এমন কি বিছানার বেড-কভারটি পর্যন্ত।

বললাম : 'কি হল। বোসো।'

কান্তা গলা ফুলিয়ে বললে, 'বসব। বসবার ব্যবস্থা রেখেছেন। কোনো মেয়ে বসতে পারে এ ঘরে।'

'তাই বলে তুমি এখন হাত দেবে নাকি এসব ব্যাপারে।'

'আমার বয়ে গেছে।' বলেও কান্তাকে কোমরে আঁচল জড়াতে দেখলাম। এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে আমার ঘরটা বাসযোগ্য করে হাত ধুয়ে তোয়ালেয় মুছতে মুছতে ঘামে জবজবে মুখে সুন্দর হাসি টেনে বললে, 'এবার চা খাব।'

চায়ের পেয়ালায় বিকেল সুন্দর হল। বিছানার ওপর পুরনো খবরের কাগজ পেতে পাশাপাশি কাপদুটো রেখেছে কান্তা। ওই দুটো কাপের দিকে চোখ রেখে কতক্ষণ চা খেতে ভুললাম আমরা। তারপর একই সময় দুজনে দুজনের চোখের দিকে চাইলাম, হাসলাম।

'কি দেখছেন অমন করে ?' চোখ নামিয়ে লজ্জাপাওয়া গলায় বললে কান্তা।

'যা দেখতে চাই।'

চায়ের ভেতরে পানীয়টুকু চলকে উঠল। কান্তা বললে, 'পড়ে যাবে।'

'যাক।' বললাম আমি।

বিকেল ঘন হল। রঙ পালটালো রোদের।

কান্তা কোলের ওপর হাতদুটো জড়ো করে বসে। একটু কুঁজো হয়ে। মুখ নিচু করে মাঝে মাঝে কথার জবাব দিচ্ছে, হাসছে। ওর সমস্ত দেহটা এখন দেহাতীত একটি অনুভূতি হয়ে উঠেছে। ওর চোখ, ওর মুখ হঠাৎ আলো লাগলে যেমন হয় তেমন এক বিচিত্র মুগ্ধতা সৃষ্টি করেছে। ওর গোটা দেহটা খণ্ড খণ্ড হয়ে কিছু স্পন্দন, কিছু রঙ, কিছু উষ্ণতায় পরিণত হয়েছে।

কান্তা একসময় বললে, 'একা থাকতে যখন পারেন না দাদার ওখান থেকে মাকে নিয়ে এলে পারেন।'

বললাম: 'মা তো পা বাড়িয়েই আছেন।'

'তবে আনছেন না কেন?'

বললাম: 'এই বয়েসে মাকে দূরে রেখে ভালোবাসা নিরাপদ।'

কান্তা বললে, 'আপনি ভীষণ স্বার্থপর।'

হেসে বললাম: 'বয়েসের ধর্মই তাই। মায়ের স্নেহ নিশ্চয়ই দরকার আছে। কিন্তু এমন একটি মেয়ের কাছে সেটা পেতে চাই যে মাও হবে প্রিয়াও হবে!'

'আপনার যত বাজে কথা।' বাজে কথার জন্যেই কিংবা অন্য কারণে হাসল কান্তা।

বললাম: 'তোমার মাকে বলব?'

কান্তা ভয় পেল। 'কি বলবেন মাকে। না না। আপনাকে কিছু বলতে হবে না। আমিই বলব।'

'তোমার মাকে বড় ভয়।'

'মাকে আপনি চেনেন না।' ক্লান্ত গলায় জানাল কান্তা। উঠে দাঁড়াল।

'চলুন। সন্ধ্যে হয়ে আসছে।' শাড়িটা গোছগাছ করে নিল। তারপর আয়নায় মুখ দেখল। 'চিরুনি আছে? চুলের কিঅবস্থা হয়েছে।

দরজায় তালা লাগিয়ে বেরুলাম দুজনে।

গ্রীষ্মাবকাশে কান্তা চলে গেল জলপাইগুড়িতে পিসিমার ওখানে। সে যে যাবে আগের দিনও আমি জানতে পারিনি। ইচ্ছে হলেও যখন তখন ওকে দেখতে পাব না এই চিন্তাই আমার দিনগুলি ভারি করে রাখল। সে নেই অথচ ওর স্মৃতির টুকরোগুলি ছড়িয়ে রয়েছে নির্জন ময়দানের চিনেবাদামের খোসায়, মহানন্দার বালির চড়ায়। এমনকি আমার ঘরের চারপাশে ওর অস্তিত্ব একেক সময় ভীষণ উগ্র হয়ে ওঠে।

এই সময় চিত্রনিভা দেবী শ্লিপ পাঠিয়ে আমাকে একবার আসতে অনুরোধ করলেন। যাব না-যাব না করেও যেতে হল।

কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দাঁড়াল চাকর।

'আপনি! দিদিমণি তো নেই।'

চাকরটা পর্যন্ত জানে এবাড়িতে কোথায় আমার আকর্ষণ। বললাম: 'মাকে বলো আমি এসেছি—'

চাকর ফিরে এসে আমাকে ভেতরেব ঘরে পৌঁছে দিল। হঠাৎ আলোর মধ্যে থেকে এসে টেবিল ল্যাম্পের স্তিমিত আলোয় ঘরের কোনো বস্তু আমার চোখে পড়ল না। মৃদু আলোকে সইয়ে নিতে কতটা সময় লাগত জানি না। চিত্রনিভা দেবীর গলার আওয়াজে এগিয়ে গেলাম খাটের দিকে। কোমরের নিচে বালিশের ঠেস দিয়ে শুয়ে আছেন তিনি, বুক পর্যন্ত সিল্কের চাদরে-ঢাকা।

'আসুন।' চিত্রনিভা মুখে রুমাল চেপে ছোট্ট করে কাশলেন।

ওঁর মাথার কাছে শোফায় বসলাম। 'কি হয়েছে আপনার?'

'পরশু থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছি।' বললেন চিত্রনিভা।

ওর মুখ ঈষৎ লাল, নাকের ডগা, চোখ দুটো ছলছল।

চিত্রনিভা হাসলেন। 'জাপানি ইনফ্লুয়েঞ্জা। ডক্টর সেন বললেন, কলকাতায় নাকি এখন খুব হচ্ছে। এই দেখুন না কী মুশকিলে পড়েছি। কান্তা চলে গেছে। উনিও নেই। মূর্খ চাকরকে নিয়ে সংসার।'

বললাম: 'মিস্টার ঘোষকে টেলিগ্রাম করে দেবো।'

'না না। উনি এসে কি করবেন। একটা চাকরকে দিয়ে যা কাজ হয় ওঁর ওপর সে ভরসা সেই।' চিত্রনিভা নিশ্বাস ফেলে পা দুটোকে আরো ছড়িয়ে দিলেন। বুকের ওপর থেকে চাদরটা স্খলিত হয়ে পড়েছিল সেটা আবার টেনে নিলেন। 'কেমন শীত-শীত করছে। দেখুন তো জ্বর এসেছে নাকি।'

কপালে হাত রাখলাম। 'না তেমন কিছু নয়।'

চিত্রনিভা হাসলেন। 'ওখানে দেখে কি জ্বর বোঝা যায়? এখানে দেখুন—'গ্রীবাদেশ তুলে ধরলেন তিনি। হাত রাখলাম সেখানে। কপোতোষ্ণ। 'হয়েছে হয়েছে। আমার জ্বর দেখতে গিয়ে যে আপনার গায়েই জ্বর ফুটছে। ভাগ্যিস আমি কান্তার মা, জানেন, নইলে কি দুর্ঘটনা ঘটত।'

আমার কর্ণমূল রক্তিম হয়ে উঠল। কোনোরকমে বলতে পারলাম: 'আপনি ওভাবে ঠাট্টা করবেন না, আমার ভীষণ লজ্জা করে।'

'লজ্জা।' নাকে রুমাল চেপে হাসিতে গুমরে উঠলেন চিত্রনিভা, তারপর হাসি থামিয়ে কঠিন গলায় বললেন, 'আচ্ছা সত্যি করে বলুন তো আমাকে কান্তার মা বলে না-জানলে।'

আমি উষ্ণ গলায় ওঁকে প্রতিহত করলাম: 'আপনি এ ধরনের আলোচনা করলে আমাকে চলে যেতে হবে।'

চিত্রনিভা চোখের ওপর আঙুল চাপা দিয়ে অনেকক্ষণ নিঃসাড় পড়ে রইলেন। যখন আঙুল সরিয়ে নিজেকে দেখালেন দেখলাম ওঁর চোখের পাতা ভিজেভিজে এবং সমস্ত মুখের ওপর বিষাদের বিষণ্ণতা। স্বগতোক্তির মতই উচ্চারণ করলেন : 'কিছু মনে করবেন না। অসুখের ঘোরে কি বলেছি।'

সেই মুহূর্তে মনে হল চিত্রনিভার মনে কোথায় ফাঁক আছে। শূন্যতার পীড়ন। মনে হল এই সংসারে তিনি সুখী নন। তাঁর মনের অস্বাস্থ্য যখন তখন ব্রণের মতো ফুটে ওঠে মুখে। তবে কি প্রৌঢ় স্বামীর ঘর তার জীবনের সমস্ত অশান্তির হেতু, বিপত্নীক মিস্টার ঘোষ দ্বিতীয়বার সত্যি সত্যি পতি হতে পারেন নি।

কান্তা ছুটি ফুরিয়ে ফিরে এল। আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে প্রথম দিন রাগ করেছিলাম, অভিমান। কান্তা এক নিমেষের কান্নায় আমার সমস্ত রাগ-অভিমানকে গলিয়ে দিয়েছিল। তারপর বিরহের ক্ষত আপনিতেই জুড়ে গিয়েছিল। আমাকে ভরিয়ে দিয়েছিল কান্তা।

কান্তাকে বললাম : 'এবার মাকে বলি।'

'এত তাড়া কিসের।' কান্তা বললে, 'আমি কি পালিয়ে যাচ্ছি।'

'তোমার তাড়া না থাকতে পারে। আমার আছে।' গম্ভীর গলায় জানালাম।

কান্তা আমার হাত দুটো চেপে ধরল। 'তুমি এমন করে বোলো না। আমার খুব খারাপ লাগে। পারো না আমার জন্যে অপেক্ষা করতে। আমি তোমার, চিরকাল তোমারই থাকব।'

ওর স্বরে ক্লান্তি ছিল, সংগ্রাম-শ্রান্ত সৈনিকের ক্লান্তি। ওর গলার কাছে একটা নীল শিরা দবদব করে উঠল। আবেগ চাপতে গেলে কান্তার অমন হয়। ওকে দেখে এই মুহূর্তে আমার কষ্ট হচ্ছিল। যেন আমার শরীরেরই কোনো একটা রক্তবাহী ধমনী ছিঁড়ে গেছে। আমার সমস্ত শরীর দিয়ে ওর ক্লান্তি যন্ত্রণাকে আমি শুশ্রূষা করতে চাইলাম।

আমার বুকে মাথা রেখে কান্তা চাপা গলায় বললে, 'আমাকে ভালোবেসে তোমার খুব কষ্ট, না? আমার মতো ভীরু দুর্বল মেয়ে--'

আস্তে বললাম: 'কেন তুমি মাকে বলছ না?'

কান্তা মাথা ঝাঁকিয়ে বিকৃত গলায় বললে, 'আমি পারিনে, পারেনি মাকে বলতে। মা সব জেনে সব বুঝেও যদি।'

তিক্ত গলায় বললাম: 'তবে কি বলতে চাও কাল নিরবধি এই ভেবে যুগ-যুগ অপেক্ষা করে যেতে হবে -'

কান্তা বললে, 'যদি করতে হয়, পারবে না?'

'ইয়ারকি কোরো না। সব জিনিসের একটা সীমা আছে।'

'আমি পারি, পারি তোমার জন্যে অপেক্ষা করতে 'মন্ত্রোচ্চারণের ভঙ্গিতে বললে কান্তা: 'লক্ষ লক্ষ যুগ ধরে, আমি জানি তুমি পারো না, তোমাকে অপেক্ষা করতে বলি এমন জোর কোথায় আমার।'

পরদিন দুপুরে কান্তার কলেজে যাওয়ার সময় লক্ষ্য করে গেলাম ওদের বাড়ি। চিত্রনিভা কড়া নাড়ার শব্দে দরজা খুলে হাসলেন। 'কান্তা তো কলেজে।'

বললাম: 'জানি। আপনার সঙ্গে কথা ছিল।'

'আসুন। বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?'

বসলাম। চিত্রনিভাও বসলেন মুখোমুখি কৌচে।

'আপিস থেকে আসছেন বুঝি?' চিত্রনিভা বললেন।

'আপনাকে যে কথা বলছিলাম—'আমি শুরু করলাম।

'একমিনিট। চায়ের জল চাপিয়ে দিয়ে আসি।'

চিত্রনিভা ফিরে এসে চেয়ার টেনে বসলেন। 'বলুন আপনার কথা—'

বললাম: 'আমি কান্তাকে বিয়ে করতে চাই।'

চিত্রনিভার মুখে কোনো রেখা অংকিত হল না। সুন্দর ললাটে, চুলের মতো সূক্ষ্ম ভাঁজ পড়ল। একটু হেসে বললেন, 'বেশ তো।'

বললাম : 'বেশ তো বললেই সব বলা হয় না মিসেস ঘোষ।'

আমার সম্বোধনের নতুনত্বে বোধহয় বিস্মিত হলেন চিত্রনিভা। ওঁর দীর্ঘ আঁখিপল্লব কাঁপছিল। একটু থেমে বললেন, 'একটু ভেবে দেখি।'

আশ্চর্য হয়ে বললাম : 'ভাববেন। এত দিনও কি আপনি ভাবেননি ?'

চিত্রনিভা বললেন : 'ভাবছি আপনার জন্যেই। কান্তাকে আপনি খুব ভালোবাসেন জানি। ভালোবাসা এক জিনিস স্ত্রী হওয়া আর এক। কান্তা সেদিক থেকে—থামলেন তিনি : 'আমাকে কয়েকদিনের সময় দিন।'

'বেশ।'

'আমাকে ভুল বুঝবেন না।' চিত্রনিভা চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিয়ে বললেন : 'কান্তার মার দাবিতেই একথা বলছিনে। আমার মতামত চাইতে এসেছেন বলেই এসব কথা উঠছে।'

বললাম : 'আপনার মত পাব আমার বিশ্বাস আছে।'

চিত্রনিভা হাসলেন। 'দেখি।'

তারপর সরকারীকাজে কয়েকদিন মফস্বলে যেতে হয়েছিল। হপ্তাখানেক বাদে যেদিন অনেক রাত্রে কোয়ার্টারে ফিরলাম পা টলছে মাথা ঘুরছে স্নায়ুকেন্দ্র ঝিমঝিম করছে। মস্তিষ্কের ভেতর ভোঁতা হাতুড়িপেটার আওয়াজ পাচ্ছি। কোনোরকমে জুতোর ফিতে খুললাম, প্যাটের বোতাম আলগা করে দিয়ে বিছানায় চুপচাপ পড়ে রইলাম। ঘুম আসছে না, মাথার ভেতরে যেন উত্তপ্ত বুদ্‌বুদ্ ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। সমস্ত শরীরটা যেন বহ্নিশিখার মতো জ্বলে যাচ্ছে। উঠলাম : পা টেনে জল গড়িয়ে ঢকঢক করে জল খেলাম। জানালার বাইরে মিশকালো রাত্রি থাবা মেলে উদ্যত হয়ে রয়েছে। আবার বিছানার দিকে এগিয়ে এলাম। পায়ে যেন কি ঠেকল।

কাগজ। না নীল খামে মোড়া চিঠি। চিঠিটা তুলে আলোর সামনে ধরলাম। অপরিচিত হাতের লেখা। শব্দ করে খামটা ছিঁড়ে ফেললাম। চিঠির মাথায় ডানদিকে জলপাইগুড়ির ঠিকানা। নিচে স্বাক্ষরকারীর নাম দেখলাম : প্রতুলচন্দ্র অধিকারী। মনে করবার চেষ্টা করলাম। না এই নামের ব্যক্তির সঙ্গে কোনোদিন পরিচয় হয়েছে বলে মনে হয় না। ঠিকানা ভুল হয়নি তো। আবার খামের ওপর ঠিকানাটা দেখলাম। না। আমার নাম ঠিকানাই লেখা রয়েছে। আমার সেই অবস্থায় চিঠি পড়ার মতো মন নয়। তবু——উত্তপ্ত মস্তিষ্কে পড়তে শুরু করলাম। 'আমাকে আপনি চেনেন না' অধিকারী মহাশয় এইভাবে শুরু করেছেন : 'কান্তার কাছে আপনার কথা খুব শুনেছি। জানেন বোধহয় কান্তা ইন্টারমিডিয়েট এখানকার কলেজ থেকেই পাশ করেছে। আমি ওর সতীর্থ বলতে পারেন'। এর পর ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের কিছু অবতারণা। 'শুনতে পেলাম আপনারা পরস্পর বিবাহের চুক্তিতে আবদ্ধ। আমি জানিনে কান্তাকে আপনি কতটুকু চেনেন, কতখানি বলেছে সে আপনাকে। আপনার শুভানুধ্যায়ী হিসেবে ওর জীবনের একটি গুপ্ত রহস্য জানাবার দায়িত্ব বোধ করছি। বিশ্বাস করুন আমি কান্তার অমঙ্গল চাইনে। কিন্তু স্বামী স্ত্রীর জীবনে বোঝাবুঝির ব্যাপারটা যত পরিষ্কার হয় সংসার তত সুখের হয়।' এর পরের লেখাগুলি আমার চোখে ঝাপসা হয়ে আসছিল, আমি আলোর নিচে এগিয়ে গেলাম। 'ঘটনাটা সংক্ষেপে এই : এখানকার সিনেমা হলের অপারেটরের সঙ্গে কান্তার মেলামেশার রকমটা শহরের আলোচনার বস্তু হয়ে পড়ে। ওদের ঘনিষ্ঠতার অনিবার্য পরিণতির কিছু সাক্ষ্য হাসপাতালের পুরানো নার্সরা দিতে পারবেন। মানুষ ভুল করে তার ক্ষমা আছে। কিন্তু এই সেদিনও এখানে এসে কান্তাকে যখন সেই অপারেটরের সঙ্গেই ঘুরতে দেখি তখন —'

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মাথার ভেতরে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। আমার মনে হল আমার চারপাশে ঘরটায় আগুন লেগে গেছে, লেলিহান ক্ষুধার্ত জিভ মেলে গ্রাস করতে আসছে আমাকে। আমি আগুনের বেড়ায় আটকে পড়েছি। আমার চুল ত্বক পুড়ছে। চামড়া তৈরির কারখানার গন্ধ নাসারন্ধ্রকে ভরে তুলেছে। যদি হৃৎপিণ্ডকে উপড়ে ফেলতে পারতাম। আমি চোখের সামনে নিজের শারীরিক পরিবর্তনগুলি দেখতে পেলাম। আমার মাথার চুল লম্বা হয়ে হয়ে রুক্ষ জটায় পরিণত হল, আঙুলের নখ দীর্ঘ হয়ে বাঁকা তীক্ষ্ণ ময়লা ভর্তি হল, চোখ কোটরাগত, চোয়ালের হাড়দুটো বিদ্রোহ করে বিপ্রতীপ কোণের সৃষ্টি করল। হলদে দাঁতগুলো মাংসাশী শ্বাপদের মতো হয়ে উঠল। আমি মানুষের ভাষা বলতে পারছিনে, নাক আর কণ্ঠনালীর সংমিশ্রণে আমার গলায় কেমন বিচিত্র সানুনাসিক ধ্বনির কতগুলো হুংকার গর্জে উঠল।

অতন্দ্র চোখের পর্দায় রাত্রির কালোকে দ্রব হতে দেখলাম। একটু ফরসা হতেই সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। শহর তখনো জাগেনি। এ-শহর জাগবার আগেই আমার কাজ সমাধা করতে হবে। আমার মনে হল এক হাতে নিয়তিকে নিয়ে আমি অবশ্যম্ভাবীর গর্ভে ছুটে চলেছি।

সাইকেলের শব্দে দরজা খুলে কান্তা অবাক খুশিতে ভরে উঠল। কিন্তু ঠোঁটের হাসি ঠোঁটেই শুকিয়ে যেতে দেরি হল না। 'একি চেহারা হয়েছে তোমার।' কান্তা ত্রস্ত আতংকিত গলায় বললে: 'অসুখ করেছে।'

ট্রাউজারের পকেট থেকে দোমড়ানো খামটা অসীম ঘৃণায় ছুঁড়ে মারলাম ওর দিকে। 'কি আছে ওতে? কার চিঠি।' খামটা

নজরে করে কি বলতে যাচ্ছিল কান্তা, আমি দাঁড়াইনি, দাঁড়াতে পারি নি, সাইকেল উড়িয়ে চলে গিয়েছিলাম। না। কোয়ার্টারে নয়। সোজা স্টেশনের দিকে।

দীর্ঘ বারো বছর পর এ কাহিনীর যবনিকা উঠল কলেজ ষ্ট্রীট-হ্যারিসন রোডের মোড়ে। গ্লোব নার্শারি থেকে কিছু ঘাসের বীজ নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম ট্রামরাস্তায়, বিপরীত দিক দিয়ে কান্তা গাড়িতে উঠবে বলেই বোধহয় স্টপে এসেছিল।

দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে কথা হারিয়ে ফেলেছিলাম। অনেক ট্রাম দৌড়ে গেল, অনেক বাস-ট্যাক্সি। শব্দ, শব্দের বৈভব, কল-কোলাহল। ক্রমাগত একটা ঘূর্ণি উঠছে বায়ুস্তরে।

'কতদিন পরে দেখা।' কান্তা হাসল, হাসলে ওর চোখের তারা-দুটো আজো টলমল করে। একটু রোগা হয়েছে। চুলের সিঁথি ফাঁকা, পাতলা হয়ে গেছে চুল। আমি কথা বলতে পারছিলাম না। গলার ভেতরে কি একটা ভারি হয়ে উঠছিল।

'এমন ভাবে দেখা হবে ভাবিনি।' কান্তা বললে মুখ নিচু করে।

বললাম: 'দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কথা হয় না। চলো। ওই রেস্তোরাঁয় যাই।'

কান্তা বললে, 'তোমার দেরি হয়ে যাবে না?'

বললাম: 'আমার তেমন তাড়া নেই।'

'হাতে কি ওটা?' কান্তা জিগ্যেস করল।

'ঘাসের বীজ।' পর্দা টেনে ক্যাবিনে ঢুকলাম: 'যোধপুর পার্কে একটা ছোট বাড়ি করেছি। সামনে এক ফালি জমি। ঘাস লাগাব সেখানে।'

কান্তা বললে, 'ফুল ছেড়ে দিয়ে ঘাস লাগাবে?'

হেসে বললাম: 'ফুলও তো শেষে ঘাস হবে। জীবনের পরিণতিই তাই। যাকগে কেমন আছো বলো।'

'ভালোই আছি। দেখতেই পাচ্ছ।' কান্তা বললে, 'কিছু খারাপ দেখছ কি?'

'মা কেমন আছেন?'

'আছেন।' কান্তা অন্যমনস্কে টেবিলের কভার টানটান করছিল। 'বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। মা দুবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। এখন আছেন লুম্বিনিতে।'

চায়ের পেয়ালায় পানীয় থেকে ধোঁয়া উড়ছিল। কারুর সাহস নেই তখন কাপ স্পর্শ করি। মাথার উপরে শব্দ করে ফ্যান ঘুরছে।

বললাম: 'কি করছ?'

কান্তা বললে, 'মাস্টারি করছি একটা ইস্কুলে।'

বললাম: 'বিয়ে করোনি মনে হচ্ছে।'

কান্তা মুখ নামাল। ওর ঝুঁকে পড়া মাথার ওপর সিঁথিটা বড় বেশি শাদা দেখাচ্ছে।

'করোনি কেন?'

কান্তা চামচ তুলে নিল, ছোট খণ্ড শব্দের তরঙ্গ তুলল কাপের গায়ে। বললে, 'তুমি করেছ! ছেলেমেয়ে কটি?'

আমি কথার জবাব না দিয়ে সিগারেট ধরালাম।

কান্তা বললে, 'এখানো রাগ যায়নি বুঝি? তোমার ছেলেমেয়েদের মাসি হয়ে আমি কি কিছু দিতে পারিনে?'

'কান্তা!' আমার গলার স্বরে কান্তা চমকে ভীরু চোখে চেয়েছিল। বললাম: 'আমি বিয়ে করিনি।'

'আমি জানতাম।' কান্তা ক্লান্ত গলায় বললে, 'তুমি তা পারো না।'

'পারিনে?'

'না।' কান্তা বললে: 'কেন তুমি অমন করে চলে এলে। আমার কোনো কথা না শুনে আমাকে এত বড় শাস্তি তুমি কেন দিলে।' কান্তার গলা ভেঙেচুরে গেল। হাঁপাতে লাগল, ওর সমস্ত মুখে শীর্ণ বেদনার কতগুলো রেখা কাঁপতে লাগল। দম নিয়ে বললে কান্তা: 'জানো ও চিঠি মা লিখেছিলেন।'

'কি বলছ তুমি।' মাথার ওপর ছাদটা ফেটে পড়লেও বোধহয় এমন চমকে উঠতাম না।

'হ্যাঁ—' কান্তা বললে, 'একটু ভালো করে দেখলেই বুঝতে পারতে। ওটা জলপাইগুড়ি থেকে পোস্ট করা হয় নি।'

আহত আতংকিত শ্বাপদের মতো নিথর নিস্পন্দ বসে রইলাম।

'পারো, পারো তুমি আমার হারানো বারো বছরকে ফিরিয়ে দিতে।' সমস্ত হৃৎপিণ্ড মুচড়ে একটা তীব্র বেদনায় দুলে উঠল কান্তা। 'বলেছিলে অপেক্ষা করতে পারবে না। তবে এতদিন কার জন্যে অপেক্ষা করে রইলে?'

'কিন্তু—এতদিন কেন আমাকে জানাও নি। আমার ঠিকানা জানতে। কেন আমাকে ভুল সংশোধন করতে দাও নি।'

'দিইনি। আমি অপেক্ষা করতে জানি।' কান্তা বললে, 'মেয়ে হয়ে তোমার চোখে মাকে ছোটো করতে চাইনি।'

'তবে, তবে আজই-বা করলে কেন।'

কান্তা বললে, 'মা তাঁর শাস্তি পেয়েছেন।'

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর বিরাট ধ্বংসস্তূপের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। অনেক স্মৃতির টুকরো, অনেক অনুভূতির গন্ধ, কিছু রক্ত বিষাদের পাহাড় ডিঙিয়ে আমাদের চেতনাকে মথিত করে তুলল।

'কান্তা—'

'কি?'

আমার আঙুলগুলো কাঁপছিল, কান্তা তুলে নিল আমার হাত, আঙুলে আঙুল জড়াল। 'ভীষণ রোগা হয়েছ তুমি।' কান্তা বললে, 'চুলে পাক ধরালে কি করে?' আমার পাকধরা চুলে করতল মেলে ধরল সে। যেন ওগুলো আমার ক্ষত। 'আর ভুল কোরো না।' কান্তা ফিস্‌ফিস্ করে বললে।

দেখলাম গলার কাছে ওর নীল শিরাটা দবদব করছে। ঠিক আগের মতো।

সপ্তর্ষি শারদীয় ১৩৬৬

সকালের স্বাদটা পাঁচন-গেলার মতো বিস্বাদ হয়ে এল কৃষ্ণপদর কাছে। যেন এই মাত্র স্ত্রী নিভাননীর অপ্রত্যাশিত কথার চড়ে বেকুব বনে গেলেন তিনি। ঘুম ভেঙে উঠে বিছানায় বসে-বসে চুরুট খাওয়ার পুরনো অভ্যেস। নির্ধূম চুরুট পুরু কালো ঠোঁটের ফাঁকে আটকে রইল। থল্‌থলে শ্লথ চামড়া পঁয়তাল্লিশ বছর-ছোঁয়া নিভাননীর রত্ন-গর্ভা দেহটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তাঁর দৃষ্টি অনড় হয়ে গেল। আর তাঁর নিজের ছাপ্পান্ন বছরের শরীরের অক্ষয় অব্যয় সামর্থ্যের পরিমাণ দেখে পাংশু হয়ে উঠল মুখ।

নিভাননীর সন্দেহটুকু সত্য বলে ভাববার সাহস জোগায় না কৃষ্ণপদর। দম বন্ধ করে বিশীর্ণ গলায় জিগ্যেস করল, 'তোমার ভুল হয়নি তো?'

নিভাননী শত্রুপক্ষের গলায় বললেন, 'দশবার আমার এই হাল করেছ। আমি জানি না কিসে কি হয়! তুমি কি বলো তো? এক ঘর নাতি নাত্‌নী তাদের চোখের সামনে দিয়ে বুড়ো মাগী আমি কি না আঁতুড়ে গিয়ে উঠব? ছি ছি!'

বুকটা ছাঁৎ-করে উঠল কৃষ্ণপদর। বয়েস বিশেষে একদা তাঁর কীর্তি আজ অপকীর্তিতে পর্যবসিত। সমবয়সী বন্ধুরা ঠাট্টা করে। বলে, 'কি হে মিত্তির, চাকরিতে অবসর নিয়েও গৃহধর্মের থেকে অবসর নিলে না।' বন্ধুরা কেন সমর্থ ছেলে মেয়েরাই কেমন অদ্ভুত চোখে তাকায় তাঁর দিকে। দশবারের বার যখন খোকন হল তখন বাড়ির বৌঝিদের গুঞ্জনের জ্বালায় তিনি ঘর বার করেছিলেন। সেই মরা গুঞ্জন কি আবার সোচ্চার হয়ে উঠবে!

চুরুটটা আঙুলে ধরে শুকনো ঠোঁট দুটো ভিজিয়ে নিলেন একবার। গলার ভেতরটা কাঠ হয়ে যাচ্ছে। কেন এমন হয়! বরাবরই স্ত্রৈণ তিনি। তাঁর ছাব্বিশ বছরে গিন্নি হয়ে এসেছে নিভাননী তখন থেকে পুরনো চালের মতো সম্পর্কটা বেড়েছে, অভ্যেসটা রপ্ত হয়ে গেছে। বড় মেয়ের বয়সই এখন উনত্রিশ—তিন তিনটে সন্তানের জননী। তারপর বছর বছর পিঠোপিঠি ছেলে, ছোট ছেলেটার বয়েস এখন সাত। ভেবেছিলেন এবার সমস্ত দুর্ণামের ইতি। কিন্তু এই ভাবে যে আবার সেই বিড়ম্বনায় পড়তে হবে কে ভেবেছিল। সব রাগটা পড়ে নিভাননীর উপর। এখনো কি উদরে চড়া পড়ল না বুড়িটার। এমন উর্বর হতে কে বলেছে ওকে! যে-বারই এই বেকায়দায় পড়েন ঘোরতর প্রতিজ্ঞা করেন এবার তাঁর বিছানা বালিশ গুছিয়ে ছাদের এক কোণে একা পড়ে থাকবেন। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞাও ধোপে টেঁকে না। নিঃসঙ্গ শয্যায় রাত্রি যাপনের কল্পনাও করতে পারেন না তিনি। বুক ধড় ফড় করে, অম্বলের চিনচিনে ব্যথাটা বাড়ে, মাথা গরম হয়। ঘুম আসে না। কাছে আসবার আকর্ষণটা কার বেশি, বোঝা না গেলেও নিভাননীকে আতুর শয্যায় অংশ গ্রহণ করতে হয়। রাত্রি পুরনো, পাশে শোওয়া মেয়েমানুষটিও পুরনো, অভ্যেসগুলিও মরচে-ধরা। যুবক বয়সের সে উন্মাদনা নেই, উত্তেজনা নেই, সত্যি কথা। কিন্তু এই বয়েসে ঘুম যেন শীঘ্রি আসতে চায় না। অনেক রাত জেগে গল্প হয়। তারপর ক্লান্ত অবসন্ন দেহে মনে গল্পের চূড়ান্ত উপসংহারের মতো যেন উত্তেজনাকে জ্বালিয়ে তুলে আগুন-পোহানো।

এবার শয্যা ত্যাগ করলেন কৃষ্ণপদ। নিত্যকার মতো কামানোর সরঞ্জাম মাথার দিকের জানালার ওপর রেখে গেছে নিভাননী। ব্রাশ সাবানে ঘষে মুখময় পালিশ করলেন কৃষ্ণপদ, ক্ষুরটার ধার একবার হাতের চেটোয় পরখ করলেন, আয়নার সামনে মুখটা এগিয়ে এনে

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন তিনি। পুরনো সুটকেসের মতো তোবড়ানো গাল, কাঁচা পাকা ভুরুর নীচে হলদেটে নিরুত্তাপ চোখের দৃষ্টি, বিশাল টাক পড়ে মাথার চাঁদিটা নারকেলের খোলের মত দেখাচ্ছে। সমস্ত শরীরে বিষণ্ণ বৈকালের ক্লান্তিকর ছায়া। সবই স্বাভাবিক। অস্বাভাবিক শুধু যৌবনের তাড়নাটুকু। ক্ষুরটা শক্ত করে তুলে নিলেন হাতে। কী আশ্চর্য, অভ্যেসের গায়ে দাগ বুলোনো আঙুলগুলি একটুও ভুল করল না। ক্ষৌরকর্ম সেরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন কৃষ্ণপদ।

বাইরে রোদ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। কলতলায় তাড়া। জলের শব্দ। বড় মেজ ছেলে ডেলিপ্যাসেনজারিতে বেরিয়ে পড়বে। ওদের বেরিয়ে পড়বার সময় দিলেন কৃষ্ণপদ। সকালের আবশ্যিক কাজগুলো নির্ভুল ভাবে করে গেলেন। তারপর কাজ সেরে আবার শামুকের মতো নিজেকে গুটিয়ে আনলেন ঘরে।

বারান্দা দিয়ে কে যাচ্ছিল। ডাকলেন কৃষ্ণপদ: 'তোর মাকে একবার ডেকে দে তো—'

একটু পর নিভাননী লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘরে ঢুকলেন। ঝাঁঝালো গলায় বললেন, 'আচ্ছা তোমার আক্কেলটা কি! কাজের বাড়ি এক ঘর লোক আর এই সময় কিনা আমাকে গোপন কথা শোনাতে ডেকে পাঠালে! ছেলেটা গিয়ে হাটের মাঝখানে চেঁচিয়ে বললে কি না: মা তোমাকে বাবা ডাকছে! ছি ছি, দিন দিন যেন রুচি খোকা হচ্ছ তুমি! তা বলো, চুপ করে আছো কেন, তোমার কাজের কথাটা বলে আমাকে উদ্ধার করো।'

দমে গেলেন কৃষ্ণপদ। যেন ভুলে গেলেন কি বলবেন। কিন্তু ভোলবার কি যো আছে। দম নিয়ে চুপি চুপি গলায় আবার জেরা করলেন তিনি: 'সত্যি বলছ তোমার ভুল হয়নি!'

'এক কথা কতবার বলব। আমি কি তোমাকে মিছে ভয় দেখাচ্ছি না কি?' রাগতে না-পেরে চাপা গলায় গর্ গর্ করলেন নিভাননী।

মাথা চুলকালেন কৃষ্ণপদ। 'না ইয়ে—অনেক সময় ভুলও তো হতে পারে—তা বলছিলাম কি চলো না একবার ডাক্তারের কাছে যাই।'

'এখন?' চোখ বড় বড় হয়ে উঠল নিভাননীর: 'ছেলে মেয়ে বৌঝিদের চোখের সামনে দিয়ে আমি এখন মেমসাহেব সেজে তোমার হাত ধরে ড্যাং ড্যাং করে বেরোব! কি বলব ওদের? হেঁসেলের আদ্ধেক কাজ পড়ে রইল, বাচ্চাদের দুধ জ্বাল দেয়া হল না—আর আমি—কী যে বলো তুমি...'

'আহা! ওদের কি আর বলবে যে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছ। একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে বললেই হবে।'

'কি বোঝাব? বাড়ির গিন্নি সকাল মাথায় কি অজুহাতে বেরোবে—'

'বলবে ষাণ্ডেশ্বর তলায় পুজো দিতে যাচ্ছ...'

'না। যেতে হয় তুমি যাও, আমি পারব না—' দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলেন নিভাননী।

কিন্তু আশংকটা নিভাননীর দিক থেকেও কম নয়।

একটু পরে ছোট ছেলে এসে কৃষ্ণপদকে ডাক দিল: 'ষাণ্ডেশ্বর তলায় যাবে বলছিলে। মা তৈরী হয়েছে। তোমাকে যেতে বললে।'

গলিতে নেমে নিশ্চিন্ত হল দম্পতি। মন্দিরের রাস্তাই তাঁরা ধরেছিলেন। ডানদিকে মোড় না গিয়ে বাঁ দিকে শশী ডাক্তারের চেম্বারের দিকে ঘুরলেন দুজনে।

অভিজ্ঞ ডাক্তারের পর্যবেক্ষণে ভুল হল না। নিভাননীর অনুমানই সত্য। মুখ কালি করে বাড়ি ফিরলেন দুজনে।

দিন কতক ঝগড়া হল তাঁদের। নিষ্ফল আক্রোশে দুজনে দুজনকে আক্রমণ করতে লাগলেন। নিভাননী বিভিন্ন সুর প্রয়োগে

অহরহ নালিশ জানাতে লাগলেন ; এমন একটা অমানুষের হাতে পড়ে তাঁর হাড় মাস ভাজা ভাজা হয়ে গেল, ছেলে মেয়ে নাতি নাতনীদের কাছে মুখ দেখাবার যো রইল না ইত্যাদি। কৃষ্ণপদও ছাড়েননি, শ্বশুর বংশ তুলে রক্ত শোষক রাক্ষসদের সঙ্গে নিভাননীর জন্মসূত্র আবিষ্কার করে প্রমাণকে জোরালো করবার জন্যে এমন নজিরও দেখালেন এই বয়সে কোনো মেয়ে গর্ভধারণ করতে পারে, সেটাই বিস্ময়ের।

কিন্তু ঝগড়া করলে যদি সমস্যা মিটে যেত, তাহলে অনন্তকাল ধরে ঝগড়া করতে প্রস্তুত ছিলেন তাঁরা।

পুত্রবধূ সুনন্দার আত্যন্তিক উৎসাহকে ফাঁকি দেবার উপায় নেই। লেখাপড়া-জানা মেয়ে শাশুড়িকে হাত করবার শিক্ষিত পটুত্ব তার আছে। সেদিন ফস্ করে বলে বসল : 'মা আপনার শরীর কি খারাপ লাগছে ?'

এক মুহূর্ত ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন নিভাননী। বধূর কথার পিছনে কোনো ইঙ্গিত আছে কি না, বোধ হয় সেটাই নিরীক্ষণ করলেন কিছুক্ষণ, তারপর হাসি টেনে বললেন, 'না বৌমা, শরীর খারাপ হবে কেন আমি তো বেশ ভালোই আছি।'

'রাত্রে জ্বর টর হয়না তো আপনার ? আমার মার হত কি না। চেপে যেতেন। তারপর যেদিন অসুখ ধরা পড়ল তখন ডাক্তারের হাতের বাইরে।'

'বালাই ! ষাট ! অসুখ আমার ত্রিসীমানা মাড়াবে না। কোনোদিন আমাকে অসুখে পড়তে দেখেছ।' নিভাননী কাজের তাড়ায় সরে গেলেন।

নিভাননী ভেবেছিলেন সুনন্দার উৎসাহ সেখানেই ভাঁটা পড়বে। কিন্তু রাত্রে বড় ছেলে শিবনাথ নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে যখন মার ঘরে ঢুকল তখন প্রমাদ গণলেন নিভাননী।

'মা আমরা কি তোমার পর হয়ে গেছি। তোমার শরীর খারাপ হচ্ছে আর আমাদের জানাবারও প্রয়োজন বোধ করোনি তুমি।'

বেশি রোজগার করার জন্যেই হোক অথবা উপযুক্ত ছেলের মায়ের প্রতি কর্তব্য করবার কর্তালিতে ক্ষুব্ধ শোনাল শিবনাথের কণ্ঠস্বর।

পুত্রের কণ্ঠস্বরে হয়ত দরদ ছিল, আকুলতা ছিল, কিন্তু শিবনাথের প্রশ্নের মধ্যে আর্থিকতার ব্যাপারটা এমন চড়া যে সহ্য হয় না নিভাননীর। সে যেন পকেটে টাকা বাজাতে বাজাতে প্রচার করতে চায় যখন তখন ষোল টাকা ভিজিট দিয়ে সিভিল সার্জেনকে আনবার ক্ষমতা তার আছে। অন্য সময় হলে রাগ করতেন নিভাননী। ছেলের বাবার উপর টেক্কা দেয়ার এই প্রয়াসকে ধিক্কৃত করতে পারতেন। কিন্তু আজ নিভাননী নিজেই দুর্বল। হেসে বললেন, 'আমার জন্যে তোরা শুধু শুধু এমন ভাবতে আরম্ভ করলে সত্যি সত্যি আমার অসুখ হবে বলে দিচ্ছি।'

'তাহলে তোমার অসুখ হয়নি বলতে চাও?' অবিশ্বাসী গলায় বললে শিবনাথ। না কি কর্তালি করবার সুযোগ হারায় দেখে হতাশ হল সে।

'বলছি আমার কিছু হয়নি। যা তোর ঘরে যা—'

'তবু সাবধানের মার নেই মা। কালকেই আমি তোমাকে ডাক্তার দেখাব।'

শিউরে উঠলেন নিভাননী। 'তোরা যদি এমন বাড়াবাড়ি করিস শিবু, সত্যি বলছি আমি যে দিকে দু চোখ যায় চলে যাব।'

চোখে আঁচল দিয়ে নিভাননীকে ফিরতে দেখে কৃষ্ণপদ জিজ্ঞেস করলেন: 'কি হল? কি বলে গেল ছোঁড়াটা?'

'কেন? তুমি শোননি?' ফোঁশ করে উঠলেন নিভাননী।

'শুনব না কেন খুব শুনেছি। মাকে উপলক্ষ করে অক্ষম বাপের উপর এক হাত নিয়ে গেল এই আর কি!' কৃষ্ণপদ চুরুট ধরালেন।

ব্যাপারটা হয়তো আরও কিছুদিন চাপা থাকতে পারত। কিন্তু সব ভেস্তে দিলেন নিভাননী নিজে। সে দিন রান্নার বালতি তুলতে গিয়ে কি রকম মাথা ঘুরে গেল, আর কোনো কিছু ধরে ঘোরানিটা থামাবার আগেই হুড় মুড় করে পড়ে গেলেন রান্নার ঘরের মেঝের ওপর। আর অজ্ঞান। কৃষ্ণপদ বাড়ি ছিলেন না, ছুটে এল বৌঝিরা। তারপর জল ঢাল-জল ঢাল, হাওয়া কর। শিক্ষিতা মেয়ে সুনন্দা বিপদে মাথা খারাপ করবার লোক নয়। নিভাননী জ্ঞান ফিরে পেয়ে দুর্বল চোখে যখন পিট পিট করে তাকালেন তখনই এসে পড়লেন ডাক্তার। নিভাননী তখন ধরা পড়বার উদ্বেগে ভয়ে-লজ্জায় কাঠ।

বড় বাজারের ডাক্তার। বয়েসের চেয়ে ভারিক্কী বেশি। নাড়ী দেখল, স্টেথেসকোপ লাগিয়ে বুক পিঠ দেখল, জিভ দেখল, চোখের মধ্যে কি দেখল সেই-ই জানে। তারপর গলায় হুকুম করল: 'কাপে করে একটু জল নিয়ে আসুন।' জল এল। ওষুধের শিশি বের করে দশ ফোঁটা ঢালা হল কাপে। নিভাননী ওষুধ গোলা জলটুকু বিস্বাদ মুখে এক চুমুকে নিঃশেষ করে পুরো করে ঘোমটা টেনে মুখ ফিরিয়ে রইলেন। ডাক্তার প্রেসক্রিপশন লিখে মৌখিক উপদেশ দিয়ে ফিজের টাকাগুলো পকেটস্থ করে প্রস্থান করল

বড় ছেলে শিবনাথ দ্বিতীয় বার তার মায়ের প্রতি প্রগাঢ় কর্তব্য-নিষ্ঠার প্রমাণ দেখাল। আপিস থেকে ফিরে আর জুতোর ফিতে খোলবার সময় নিল না, না এক গ্লাস জল পর্যন্ত নয়। তেমন অবস্থায় ছুটল ডাক্তারের কাছে। ওষুধ পত্তরের কথা পরে আগে সঠিক রোগটা জানা দরকার। অমনি তার অফিসারের ধড়া চূড়াও দেখানো হয়ে যাবে। কারণ শিবনাথ জানে ডাক্তাররা রুগীর কৌলিন্য দেখে কুলীন ওষুধ পত্রের ব্যবস্থা করে থাকে।

ফাঁসা বেলুনের মতো চুপসে মুখ অন্ধকার করে ফিরল শিবনাথ।

ডাক্তারের কথাটা এখনো কানে বাজছে। 'আপনার মা? নাথিং সিরিয়াস। সী ইজ ইন এন ইণ্টারেসটিং কনডিশান...' ডাক্তারের মন্তব্য শুনে বিস্ময়-বিমূঢ় দাঁড়িয়ে পড়েছিল শিবনাথ। তারপর নিজেকে হেঁচকে টেনে টলতে-টলতে বেরিয়ে পড়েছে চেম্বার থেকে। মাঠের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ঘটনাটা ভালো করে বোঝবার চেষ্টা করতে করতে হঠাৎ মস্তিষ্ক গরম হয়ে ওঠে, চোখ জ্বালা করে আর হাতের আঙুলগুলো হিষ্টিরিয়ারুগীর মতো শক্ত হয়ে ওঠে।

বাড়ি ফিরে দাঁড়াল না শিবনাথ। সোজা ঘরে এসে ঢুকল।

কিন্তু এ কেমন ব্যবহার। সারা বাড়ি উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করছে শোনবার জন্যে। আর মানুষটা কি না চুপ করে আছে। সুনন্দা জলদ পায়ে এল, পেছনে পেছনে মেজ সেজ ভাই।

তবে কি খুব বাড়াবাড়ি অসুখ!

'কী কী বললেন ডাক্তার?' স্ত্রীর দাবিতে সুনন্দাই প্রথম নীরবতা ভাঙল।

ততক্ষণে জুতো খুলেছে শিবনাথ, টাইটাও আলগা করেছে, কোমরের বেল্ট ঢিলে করে খাটে হেলান দিয়ে বসেছে।

'কী গো কথা বলছ না কেন?'

শিবনাথের উত্তরে ঘরে যেন বাজ পড়ল।

'মার ছেলে হবে।'

ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও বোধ হয় দরজার আড়ালে আড়ি পেতে ছিল। খবরটার নতুনত্ব মুহূর্তে চাঙ্গা করে তুলল তাদের। 'কী মজা, কী মজা! আমাদের মামু হবে, কাকু হবে। ভাই হবে।'

সুনন্দা তাড়িয়ে দিল অসভ্য পঙ্গপালদের।

মেজ ছেলে সীতানাথ সাইকলজির ছাত্র। 'আমরা সকলেই এই ভাবে জন্মেছি বড়দা। আমাদের জীবনটাই এ্যাকসিডেণ্ট। ভালোবাসা নয়, স্নেহ নয়, মমতা নয়। আমরা—'চুপ করে গেল সীতানাথ।

দার্শনিক তত্ত্বের জন্যেই বোধকরি আবহাওয়া শ্বাসরুদ্ধ হয়ে রইল।

ওদিকে বিছানায় শোয়া অবস্থায় নিভাননী একটু জলের জন্যে চিঁচি করছিলেন। এতক্ষণ যারা তাঁর রোগশয্যা ঘিরে বসেছিল এখন তাদের কাউকেই ধারে কাছে দেখা গেল না। সন্ধ্যারাত্রির বিপুল নির্জনতা হাঁপ ধরিয়ে দিল নিভাননীকে।

কিন্তু আজ এত দেরী হচ্ছে কেন ফিরতে কৃষ্ণপদর। কলকাতায় গেছেন পেনশনের টাকা আনতে।

স্বামীর জন্যে উদ্বেগ বোধ না করে পারেন না নিভাননী। আজ দীর্ঘ বছর পরেও মানুষটার মূল্য তাঁর কাছে অত্যন্ত গভীর। নির্ভর করবার এক মাত্র লোক। বুড়ো বয়সে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা কেমন মাতা পুত্রের সম্পর্ক হয়ে পড়ে। বুড়ো শিশুটির মধ্যে মাতৃত্বের স্বাদ পান যেন নিভাননী। ছেলে মেয়ের ওপর বিশেষ ভরসা রাখেন না তিনি, কোনো দাবিও হাজির করতে চান না। ছেলে মেয়েরা বড় হলে বাবা হয় মা হয়, নিজেদের সংসার গড়ে ওঠে। মার সংসারটা তখন শুকিয়ে-যাওয়া ফুলের মত ভুঁয়ে ঝরে পড়ে। সে কারণে নালিশ নেই অভিযোগ নেই নিভাননীর।

চুপি পায়ে কে ঢুকল ঘরে।

'কে রে?'

'আমি—'

নিভাননীর ছোট ছেলে। নিরু।

'আয়—আমার কাছে আয়—' নিভাননী সস্নেহে ডাকলেন।

'না।' নিরু মাথা ঝাঁকাল। 'দিদি-বৌদি বারণ করেছে।'

'বারণ করেছে!' আশ্চর্য হলেন নিভাননী: 'কেন?'

'তোমার কাছে এখন যেতে নেই।'

ধক্ করে উঠল নিভাননীর বুকের ভেতরটা। 'ওরা আর কি বলেছে?'

'আমার ভাই হবে।' নিরু বললে।

'আমি বলছি। আয় আমার কাছে।'

নিরু পায়ে পায়ে এল।

ঘরের সামনে বারান্দা দিয়ে কারা ছুটে গেল। চাপা হাসিও শুনতে পেলেন বলে মনে হল নিভাননীর। ঠোঁট কামড়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। যে গোপন লজ্জাটুকু নিয়ে নিজেকে আব্রু দিয়ে চলছিলেন তিনি, এখন সেটা একেবারে খসে গেল। যেন বাড়ির লোকদের বেয়াদপি তাকে কঠিন করে তুলল। না, আর লজ্জা পাবেন না নিভাননী। তিনি কোনো অন্যায় করেননি, তাঁর মাতৃত্বের পিছনে কোনো সংকোচের কারণ নেই। শয্যা থেকে দেহকে তুলে যদি একবার বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে পারতেন।

কিন্তু সব চিন্তা ছাপিয়ে এখন স্বামীর চিন্তাই প্রবল হয়ে উঠছে। আজ বড় দেরী হচ্ছে কৃষ্ণপদর ফিরতে।

কৃষ্ণপদ ফিরলেন রাত্রি করে। পেনশনের টাকা নিয়ে একবার বড়বাজারে নেমে কেনা কেটা করতে দেরী হয়েছে।

সদর দরজার সামনে এসে বাড়িটা পুরু অন্ধকারে ভুতুড়ে মতো দেখাচ্ছিল। এত অন্ধকার কেন। বাড়িতে কোনো সাড়া শব্দ নেই। একটা ঘরেও কি আলো জ্বলছে না।

'এই কোথায় গেলি সব। আলো জ্বাল—'নিজের সাড়া দিয়েই যেন সারা বাড়িটা জাগিয়ে তুলতে চান কৃষ্ণপদ।

'কে?'

'আমি—'

'সীতানাথ?'

'হুঁ—'

'অন্ধকারে তোরা কি করছিস। আলো জ্বালাসনি কেন?'

'কি হবে আলো জ্বেলে!' দার্শনিক সীতানাথ বললে। 'আমাদের

অন্ধকারই ভালো।'

এমন উত্তরের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না কৃষ্ণপদ। হোঁচট সামলে নিয়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ালেন তিনি। যেন অনেক দিন পর বুঝলেন কৃষ্ণপদ : ছেলেরা আজ কাল তাঁকে শ্রদ্ধা করে না। অস্তগামী সূর্যকে কেউ পুজো করে না। ছোঁড়া কি জানেনা বাপের টাকাতেই ওর দর্শন-শেখা। ছোট বেলায় কত বেত ভেঙেছেন ওর পিঠে, সে দাগগুলি কি এতদিনে শুকিয়ে গেছে।

সীতানাথ শুকনো গলায় বললে : 'ডাক্তার এসেছিল—মা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন—'

বুক শুকিয়ে গেল কৃষ্ণপদর। রাগটাও কমল। কেমন ভীতু হয়ে পড়লেন কৃষ্ণপদ। ছেলের কথা আর শোনবার জন্যে দাঁড়ালেন না তিনি। চোরের মতো নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। না। এই ঘরে একটা মৃদু আলো জ্বলছে।

'এত দেরী হল ফিরতে!' নিভাননীর গলা ভিজে ভিজে।

স্ত্রীর শয্যার কাছে হেঁটে এলেন কৃষ্ণপদ। 'অসুস্থ হয়েছ শুনলাম; কেমন আছ এখন?'

'ভালো। তুমি আমার কাছে বোসো।'

কৃষ্ণপদ নিভাননীর ঘামে ভেজা হাতটা নিজের হাতে তুলে নিলেন, হঠাৎ স্ত্রীর দিকে ভালো করে তাকাতেই প্রশ্নভরা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কাঁদছিলে?'

নিভাননী চুপ করে রইলেন। তারপর ক্লান্ত গলায় বললেন, 'চলো আমরা অন্য কোথাও চলে যাই।'

'কেন? চলে যাব কেন?' কৃষ্ণপদ দম নিয়ে বললেন : 'আমার ঠাকুরদার বাড়ি। বাবা জন্মেছেন এখানে, আমি জন্মেছি! এ-বাড়ির সঙ্গে আমার নাড়ীর যোগ। যেতে হয় যারা যাবার তারা যাক।'

'ছি ছি ও কথা বোলো না, ছেলেদের সংসার হয়েছে, ছেলেপিলে

হয়েছে নিজেদের সামলাতে ওরা হিমসিম খাচ্ছে। আমরা বুড়োবুড়ি ওদের ঘাড়ে চেপে থাকি কেন?'

গম্ভীর মুখে কৃষ্ণপদ বললেন, 'কে কি বলেছে তোমাকে শুনি? ছেলে বলে আমি ওদের রেহাই দেবো না।'

'আ, কি যা তা বকছ। ওরা আবার কি বলবে।'

'অনেক সয়েছি। আর নয়। দ্যাখো গিন্নি ছোট বেলা আমার বাবা মারা গেছেন। পড়াশোনা হয়নি। নিজের চেষ্টায় ঢুকেছি ব্যাঙ্কে। ধাপে ধাপে উন্নতি করেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ ছিল না বলেই নেহাৎ অফিসার হতে পারিনি। ছেলেদের মানুষ করেছি, উচ্চ শিক্ষিত করেছি। ওরা রোজগার করতে পারছে তাতেই আমার আনন্দ। বুড়ো বয়েসে ছেলেরা আমাকে খাওয়াবে ওদের গলগ্রহ হতে হবে—এমন চিন্তা কস্মিন কালেও ছিল না। দুশো টাকা পেনশন পাই আজো—তাতে আমার নাবালক ছেলেদের নিয়ে আমাদের দুটো প্রাণীর চলে যাবে।'

'এসব কথা বলছ কেন?'

'বলছি এই কারণে যে মোটা রোজগার দেখিয়ে আমার ছেলেরা বাপের উপর কর্তালি করবে, এ আমি মেনে নেবো না। এ সংসারের কর্তা আমি, যতদিন বেঁচে আছি ততদিন আমিই থাকব। আমি প্রাচীন কালের মানুষ হালের ছেলেদের সঙ্গে বেঁচে থাকার ব্যাপারে কোনো মিল নেই, হতে পারে না।' একটু থেমে শেষ করলেন কৃষ্ণপদ: 'প্রকৃতির নিয়মে জীব আসবে পৃথিবীতে। আজকের ছেলেরা দাম্পত্য সম্পর্ককে ধর্ম বলে মানে না। তাই ধর্মকে বিকৃত করে সুস্থ বিবাহিত জীবনকে একটা কিম্ভূতকিমাকার অবস্থায় দাঁড় করিয়েছে।'

'তুমি চুপ করো। কেন মিছি মিছি মাথা গরম করছ?' নিভাননী দুর্বল গলায় বাধা দিতে চাইলেন।

কৃষ্ণপদ হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'মাথা গরম আমি করিনি বড় বউ। আমি লক্ষ্য করেছি আজকের যুবকদের। কাণ্ডজ্ঞানহীন অই সব অর্বাচীনের দল। সরকার পর্যন্ত খেপে গেছে। আজকের যুবকদের কানে কানে মন্ত্র দিচ্ছে পরিবার নিয়ন্ত্রণ করো। না, সংযমী হবার উপদেশ নয়, কেবল বিজ্ঞানের কলা কৌশলগুলি রপ্ত করো। ছি ছি! এর চেয়ে কুৎসিত ব্যাপার কি আছে। সন্তান কমাও আন্দোলন না করে তারা যদি জমি জমা সুষ্ঠু বণ্টন করে উৎপাদনের বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতেন, সেটাই হত আসল কাজ।'

রান্নার ঘর থেকে খাবার তাগাদা এল। কৃষ্ণপদ ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

মাথার ভেতর এখন পরিষ্কার। যেন ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সংকুচিত লজ্জিত কৃষ্ণপদ যুক্তিগুলি শক্ত করে বেঁধে নিয়েছেন। তাঁর আগের সমস্ত দ্বিধা দ্বন্দ্ব গুঁড়িয়ে গিয়ে আবার যেন মেরুদণ্ড সোজা করে চলতে পারছেন।

নিজের এই আত্মদর্শনে অপরিসীম তৃপ্তি বোধ করলেন কৃষ্ণপদ।

না কোন গুঞ্জন নয়, চাপা ফিস ফিস নয়, হাসি নয়। যেন কৃষ্ণপদর গম্ভীর দৃঢ় মুখাবয়ব দেখে সারা বাড়ি থমথমে হয়ে গেছে। কৃষ্ণপদর যেন নতুন জ্ঞানোদয় হল: বুড়োমানুষেরা সংসারের থেকে সরে গিয়েই নতুনদের কাছে বাতিল, বাড়তি গণ্য হয়েছে। অধিকারকে বজ্র মুঠিতে ধরে রাখলেই কেবল নিজেকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত রাখা যায়।

তবু শেষ রক্ষা হল না ছেলে মেয়েরা শেষ পর্যন্ত হারিয়ে দিল কৃষ্ণপদকে। সমস্ত বিশ্বাস, ধ্যান ধারণা নিয়ে প্রাচীনকে বোধহয় ফাজিল যুগের কাছে এমনি করে হার স্বীকার করতে হয়। ধূর্ত অর্বাচীনদের সঙ্গে পেরে উঠবেন কেন তিনি।

রাত্রে খাওয়া দাওয়া সেরে নিজের ঘরের দরজায় পা দিতে গিয়ে

থমকে দাঁড়ালেন কৃষ্ণপদ। মেঝে ভরতি ঢালা বিছানা পাতা হয়েছে। আর বাড়ির শিশু বাহিনীরা ক্লান্ত ভঙ্গিতে কেউ ঘুমিয়ে, আর কেউ তখনো চোখ পিট পিট করছে। নিভাননীর খাটের বিছানাতেও দিব্যি একজন জায়গা দখল করে শুয়েছে।

'এই—কে তোদের এ ঘরে শুতে বলেছে? এঁ্যা?'

'মেজ কাকু। আমরা আজ থেকে এ ঘরে শোব, দাদু। তোমার বিছানা ছাদের ঘরে।' ছেলেটি বললে।

বিবর্ণ পাংশু মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন কৃষ্ণপদ। না, রাগতে পারলেন না। সমস্ত অনুভূতি অসাড়, পংগু। ছেলেরা যে তাঁকে জব্দ করতে এই ভাবে বাড়ির বাচ্চাদের লেলিয়ে দেবে, ভাবতে পারেননি তিনি। বাবাকে জব্দ করতে গিয়ে ছোটদের কাছে এইভাবে তাঁর মাথা চিরদিনের জন্যে ওরা হেঁট করে দিতে পারল, গভীর ক্ষোভের মধ্যে বোধ করলেন কৃষ্ণপদ। এমন অশ্লীল নোঙরা কায়দায় গা ঘিনঘিন করে উঠল তাঁর।

বুড়ো মানুষের পাথুরে চোখে যে জল থাকতে পারে এবং বুড়ো বয়েসে কান্নার স্বাদও এমন হতে পারে, কে ভেবেছিল। কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে কৃষ্ণপদ দোতলার সিঁড়ির দিকে হেঁটে গেলেন।

নবান্ন শারদীয় ১৩৬৭

অজগর

আজকেও মোক্তার লাইব্রেরিতে এসে চূড়ান্ত অপমান করে গেছে সাহাদের গোমস্তা। প্রথম যখন পাদ্রী টমাস সাহেব এসেছিলেন এ অঞ্চলে সে আমলের একতলা বাড়ি। ঝরঝর করে দেয়ালের পলেস্তারা খসে পড়ছে, বর্ষাকালে ছাদ চুঁইয়ে জল পড়ছে অনর্গল। কপাট লাগে না, জানালা চেপে বন্ধ করলেও আলগা থাকে—ধুলো আসে, বৃষ্টি আসে। আর সবচেয়ে আশ্চর্য সতেরো শতকের পরেও তিনটে শতাব্দী এগিয়ে এসেছে। শহরে দু দুটো সিনেমা হল, বিহানী কোম্পানীর ইলেকট্রিক আলো। কিন্তু, কী আশ্চর্য কায়দায় নতুন শতকের সুখ সুবিধেগুলোকে এ বাড়ি দূরে ঠেলে রেখেছে। ইলেকট্রিক বাতি নেই, কেরোসিনের আলো। বাড়িঅলাকে বলতে গেলে বলে, পনেরো টাকা ভাড়ায় আলো হাওয়ার কল্পনা করাও হাস্যকর মোক্তার মশায়।

পনেরো টাকা ভাড়া শুনতে এমন কিছু নয়। কিন্তু এই পনেরো টাকাই ছ'মাস জমেজমে কত হয়! এত জলদে তার চোখের সুমুখ দিয়ে সব কিছু পরিবর্তন হয়ে গেল যে না-পারল জয়নারায়ণ তাকে ঠেকাতে না-সমান তালে এগিয়ে যেতে। দেশ-বিভাগের তোড়ে ভাসতে-ভাসতে এই বিদেশ শহরে এসে বাপ মার সঙ্গে যখন ডাঙা নিল জয়নারায়ণ তারপরেও দীর্ঘ বছরগুলোর অপচয় হয়েছে। মা আগেই পরপারে যাত্রা করেছিলেন, কিছুদিন পর বাবাও গেলেন। যাবার আগে কি জানি কি মনে করে ধরে বেঁধে বিয়ে দিয়ে গেলেন একমাত্র সন্তানের। মানুষ দরিদ্র হতে পারে, এ দেশের কজন লোকই-বা ধনী, কিন্তু বংশলতাকে অব্যাহত রাখতে হবে। মনে রেখো আমরা কাশ্যপমুনীর বংশধর।

বাবার কথা মনে রেখেছে বৈকি জয়নারায়ণ। ম্যাট্রিক কোনো রকমে পাশ করে, ভাগ্যই বলতে হবে, দ্বিতীয় চান্সে মোক্তারী পাশ করল সে। আর তারপরেই এক শুভদিন দেখে দুর্গা দুর্গা বলে যাত্রা করল মোক্তার-বারে। সেটা উত্তুঙ্গ যৌবনকাল। কিন্তু যৌবন হল বৈরী। কোন্ মিথ্যেবাদী বলে, যৌবনের পক্ষে কোনো কাজই অসাধ্য নয়। এই মিথ্যা হাড়ে হাড়ে বুঝেছে জয়নায়ায়ণ। দু'প্রস্থ পেণ্টুলনের খরচ তোলাই ভার। আর সবচেয়ে অসুবিধে হল পশার তৈরী করা। প্রথমত স্বভাবত মুখচোরা জজ মুন্সেফের সামনে তো বটেই এমন কি মামলাবাজ মক্কেলের কথার তোড়ে পর্যন্ত খেই হারিয়ে ফেলে জয়নারায়ণ। আর, পারল না চড়া দরে ফিস্ বেঁধে রাখতে। এমন কি কেস্ ধরবার সময় বায়নার টাকাটাও কায়দা মতো মক্কেলদের কাছ থেকে হাতাতে পারত না সে। ফলে যত কেস্ করল তার চেয়ে অনেক কম জুটল টাকা। মক্কেল সরল। আর শেষ পর্যন্ত জামিন নেবার মোক্তারের মর্যাদাতেই তার স্বীকৃতি সীমাবদ্ধ রইল।

অবশ্য এক একদিন বেশ্যার দালালরা কেস নিয়ে আসে। প্রথম প্রথম লজ্জায় ওসব মামলা নিত না জয়নারায়ণ। কিন্তু পরে ভেবে দেখল : খদ্দের হচ্ছে লক্ষ্মী। কাজেই হাতের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলার অর্থ নেই। এইসব কেসেই মাঝে মাঝে মোটা রোজগার হত। কিন্তু সম্প্রতি সরকার বাহাদুরের আইনে জমিদারি তুলে দেওয়ায় যেমন ক্ষতি হয়েছে ফৌজদারি মামলায় তেমনি সমস্যা দেখা দিয়েছে পতিতাবৃত্তিকে বেআইনী করে।

তাছাড়া জীবনের সবক্ষেত্রেই পরাজিত হয়ে ম্যাট্রিকুলেট তরুণেরা হয় বেসিক ইস্কুলে মাস্টারি অথবা মোক্তারির পথ বেছে নিয়েছে। এ লাইনে লোক বেড়েছে আর বেড়েছে পশারহীন বেকারী। আটত্রিশ বছর বয়সের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে জয়নারায়ণ না হতে

পেরেছে প্রবীণ না নবীন। বয়েস তাকে করেছে সংসার সম্পর্কে ভীরু। যতক্ষণ বাইরে থাকে একটা অনিশ্চয়তা কি হয় ভাব তাকে সদা সন্ত্রস্ত রাখে। শীতের দেশে প্রাণীদের যেমন পুরু লোমের আচ্ছাদন রয়েছে, তেমনি মোক্তারির তকমাআঁটা ছিটের কোট-পেণ্টুলনে বাইরের তাপ থেকে রক্ষা পাবার খানিকটা উপায় আছে। চুলের দুপাশে শাদাটে পালিশ আর চোখের খাঁজে আঁকিবাঁকি লক্ষ্য হলেও কি হবে, কোট-পেণ্টুলনে মোড়া তার হ্রস্ব দেহ তাকে এ-সংসারের খেটে-খাওয়া মানুষদের শামিল করে তুলেছে। অন্তত লোকে বলবে না জয়নারায়ণ কর্তব্যচ্যুত দায়-দায়িত্বহীন বাজে, অকেজো। নিয়মিত কোটে হাজিরা দেয়, অদ্ভুত ধৈর্য আর চেষ্টা। সমর্থ পুরুষ মানুষ, নেশা নেই, বাড়তি খরচ নেই। না চা, না সিগারেট-বিড়ি, না পান। তাহলে এ লোককে তুমি বেহিসেবী, কাণ্ডজ্ঞানহীন বলতে পারো না। কিন্তু বাড়িঅলা সাহা তা বোঝে না। তার কাছে একটা লোকের চেষ্টা তার নিষ্ঠার কোনো দাম নেই। ফেল কড়ি মাখো তেল এই দস্তুর।

আজকে সত্যি নিদারুণ অপমান করে গেছে সাহাদের গোমস্তা, বলেছে, অনেক তো হল, এবার মানে মানে বাড়ি ছেড়ে পথ দেখুন। বাবু বলেছেন: আজকের দিনে বিনা ভাড়ায় মানুষকে বাড়িতে পোষার চেয়ে পশুদের পরিচর্যা করা ভালো। তাঁর মতলব আছে জয়নারায়ণকে সরিয়ে সারিয়ে এই বাড়িটাকেই একটা ডেয়ারী ফার্ম করা। শহরের উপকার হবে তাতে। ভিনদেশী গয়লাদের পাউডারের গুঁড়ো ফেলে টাটকা খাঁটি দুধ খেতে পারবে ভদ্রলোকেরা। এমন সাধু উদ্দেশ্য সত্বেও জয়নারায়ণ পথ দেখেনি। এমন কি অনেক সময় বিশ্রী মেজাজে এমন মন্তব্যও করেছে যাতে বোঝা গেছে ওই অবলা পশুদের সঙ্গে একই বাড়িতে বাস করতে তার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু, আপত্তি আছে সাহাবাবুদের। আপত্তি ঈশ্বরের সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ প্রাণী মানুষ আর গোজাতির একত্র থাকায় নয়।

আপত্তিটা এইজন্য যে জয়নারায়ণের মতলবটা আর কিছু নয়: ফলের বাগানে পাখির পাহারা দেয়ার মতো। খিদের জ্বালায় ওরা স্বামী-স্ত্রী মিলে যদি রাতারাতি গোরুর বাঁট থেকে দুধ গেলে চোঁ চা সাবাড় করে দেয়, তাহলে!

বুকের ভেতরের চ্যাট্‌চেটে উদ্বেগটুকু শক্ত খোলস দিয়ে আটকে রেখে শামুকের মতোই তবু বাড়ি ফিরল জয়নারায়ণ। তক্তপোশে বসে আস্তে আস্তে জুতোর ফিতে খুলল, জুতো জোড়া আলনার নিচে ছেড়ে দিয়ে কোটটা খুলে বিন্দুবাসিনীর পরিত্যক্ত ডুরে শাড়িটা কোমরে জড়িয়ে নিল। আঃ। অনেক নির্ভয়, অনেক স্বচ্ছন্দ এখন জয়নারায়ণ। এখন গুণগুণ করে যদি এককলি রামপ্রসাদ গায়, কেউ আপত্তি করবে না। হাতপাখাটা তুলে নিল। কাঁসার গেলাসে জল আর একটু গুড় নিয়ে এল বিন্দুবাসিনী। রোজকার জলখাবার।

ত্রিশটি যৌবন পার করে দেয়া বিন্দুকে দেখে মাঝে মাঝে এখনও অবাক হতে হয়। অনাহার অনশন সবকিছুকে টেক্কা দিয়ে ভরাট যৌবনকে বিন্দুমাত্র টোল খেতে দেয়নি বিন্দু। তন্বী নয়, পৃথুলা নয়, যৌবনের জোয়ার হঠাৎ থমকে থেমে দাঁড়িয়েছে ওর দেহের দুয়ারে। ওকে দেখে পুলিশকোর্টের গায়ে সেই পুষ্পিত কৃষ্ণচূড়া গাছটির কথা মনে পড়ে যায়। ফল নেই, তবু ফুল ফুটিয়েই তার আনন্দ। নিষ্ফলা বিন্দুবাসিনীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায় জয়নারায়ণ। মা হতে না পারার কি কোন ক্ষোভ নেই ওর। সে কি শুধু রমণী থাকতে চায়। আর রাত্রির অন্ধকারে সারাদিনের ক্ষুধার্ত দেহটা যখন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে তখন বিন্দুবাসিনীর দেহের শাখা-প্রশাখায় নিজের সজ্ঞান লজ্জাকে ঢাকবার প্রশ্রয় পায় জয়নারায়ণ। এবং তখন অব্যয় অক্ষয় বিন্দুবাসিনীর শরীরটার ওপর বিশ্রী আক্রোশ জন্মে। একটা অশ্লীল চিন্তা কিলাবলিয়ে ওঠে মনের মধ্যে। ভোগ্য হওয়া ছাড়া যে নারীর শরীরের অন্য কোন উদ্দেশ্য

নেই তাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করা শক্ত। মনে হয়: বিন্দুর বন্ধ্যাত্ব দৈহিক বিচ্যুতি নয়, মানসিকতার অভাব। বিন্দু মা হতে চায় না মনে মনে তাই তার দেহেও মা হবার কোনো লক্ষণ প্রতিফলিত হয় না।

উপার্জনের অন্ধকারে পথ হাতড়ে-ফেরা আরো দশটা নিরীহ বাঙালীর মতো কোণঠাসা একটা দর্শন গড়ে তোলে জয়নারায়ণ। আর ক্ষুধার্ত ইঁদুরের মতো কুশকুটিল হয়ে পড়ে ওর মনের চেহারা। একসময় মনে হয় বিন্দুবাসিনী তাকে ফাঁকি দিয়েছে এই দীর্ঘ বছর ধরে। তাকে যোগ্য স্বামীর মর্যাদা দেয়নি। দাম্পত্য জীবনের কোন সাধ মেটায়নি সে। জয়নারায়ণের পরম পূজনীয় পিতার শুভেচ্ছাকেই ব্যঙ্গ করেছে বিন্দু। বংশধারা রাখবার কোনো চেষ্টাই নেই তার হাবভাবে।

সংসারের সব উত্তাপ সহ্য করতে হবে জয়নারায়ণকে আর বাড়ির ছায়াশীতল কোণে বসে চুল খুলে চুল বাঁধবে বিন্দু, গা ধোবে, পরিপাটি করে বাড়ির কাচা জামা কাপড় পরে ফিটফাট থাকবে, পায়ে আলতা ঘসবে, সিঁথেয় স্বামী-সোহাগিনী সিঁদুর লেপবে— এ দৃশ্য যতই কাব্যিক হক, এর মধ্যে রয়েছে স্বার্থপরতা, একলাপনা। সংসারে কত ধানে কত চাল হয়, তার খবর রাখে বিন্দুবাসিনী, রেশনে চাল উধাও কি কেরোসিন ব্ল্যাক হচ্ছে, খবর রাখে কিছু সে? সংসারটা তুজনের। সুখ ভোগ তুঃখ ভোগ উভয়েরই। কিসের আশায় সংসারের ঘানি একা-একা ঘোরাবে সে।

চিন্তাটা জয়নারায়ণের পক্ষে অদ্ভুত হলেও অতি সম্প্রতি এরকম ভাবতে শিখেছে সে। মেয়েপুরুষের সমানাধিকারের তর্ক হামেশাই মোক্তার-বারের মেনুতে আজকাল স্থান পেয়েছে। এইতো সেদিন ছোকরা মোক্তার বিমলানন্দ একজন ইস্কুল মিসট্রেসকে বিয়ে করল, তুজনে চমৎকার সুছন্দে সংসারযাত্রা নির্বাহ করছে। স্ত্রীর দিক থেকে

রোজকারের কথা যখন ভাবে জয়নারায়ণের মুখ কালো হয়ে যায়। গেঁইয়া নেহাৎ অশিক্ষিত বিন্দুবাসিনীর কথা মনে পড়লেই মুখ ব্যাজার হয়ে যায়। না-ঘরের না-ঘাটের। একটা দেহসর্বস্ব স্থূল পুতুল ছাড়া আর কী। যতক্ষণ বাড়িতে থাকে জয়নারায়ণ কেবল বিন্দুর দৈহিকতার আটপৌরে আকৃতিটুকুই চোখের সামনে নড়ে বেড়াতে থাকে। আর তখন বিশ্রী তেতো স্বাদের সঙ্গে জয়নারায়ণের মনে হয় এ মেয়ের যদি রোজকার করার কোনো গুণ থাকে তবে তা দেহ খাটানোর। জয়নারায়ণের ধার্মিক বাবা ছেলের এ চিন্তার পরিচয় পেলে হয়তো আঁতকে উঠতেন। কিন্তু জয়নারায়ণ পৃথিবীর অনেক কিছু দেখেছে, জেনেছে। না-শহর না-গ্রামীণ শহরের অতি-চালাকের ঢঙে তার মনের গড়নটুকুও বেঢপ হয়ে উঠেছে। গ্রামের দুর্গন্ধ আর হবু শহরের উচ্চকিত সৌগন্ধ মিলে অর্ধপক্ক হয়ে উঠেছে ওর মস্তিষ্ক। আর জয়নারায়ণের মতো কর্মে অপটু লোকেরা চিন্তা করে বেশি, ভাবনার মধ্যে দিয়ে অতিশয় চালাক হতে চায়। বোধ হয় বেশ্যাদের মামলা করতে গিয়ে এ ধরনের চিন্তা কাজ করে থাকবে।

অবশ্য স্ত্রীর একটি প্রতিভার প্রশংসা করতে হয়। তার রান্নার। কম তেলে উপকরণের অভাবেও ওর সজনের পাতা সেদ্ধ পর্যন্ত অমৃত হয়ে ওঠে। ওর সীমের চচ্চড়ির স্বাদ মুখে লেগে রয়েছে জয়নারায়ণের। কিন্তু অভাবকে যারা নির্দ্বিধায় মেনে নেয় তাদের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ জয়নারায়ণের। এর চেয়ে যদি কলহ করত, চিৎকার করত বিন্দু তাতে অভাবের তীব্রতাটুকু বোঝা যেত। বোঝা যেত মানুষ দারিদ্র্যে সন্তুষ্ট নয়, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সোচ্চার হয়ে উঠছে। আর এতে করে স্বামীর বীর্য খর্বিত হয়, মনে হয় দরিদ্র স্বামীর অক্ষমতাকে কৃপা করছে সে। পতিত্বের একটা স্পর্ধিত অহংকার আছে বিন্দুর ব্যবহারে তা যদি তিলে তিলে ক্ষয় হতে থাকে তাহলে আর জীবনধারণের অর্থ কী।

একদিন জোর করে বলেছিল জয়নারায়ণ: 'কেন তুমি শাড়ির জন্যে ঝগড়া করো না? সব মেয়েই স্বামীর কাছে যা আকাঙ্ক্ষা করে তা কি তুমি পেতে চাও না?' বিন্দুবাসিনী হেসেছিল। 'শাড়ি পরে আমি কি বাড়ির বাইরে যাই? আর গয়না দেখাব কাকে, প্রতিবেশীরা চটবে না? মাগো আমার লজ্জা করে।'

'তুমি মিথ্যে কথা বলছ!' জয়নারায়ণের চোখ ক্রুদ্ধ সাপের মতো জলে উঠত।

'না গো।' আতুরে গলায় বলত বিন্দুবাসিনী: 'তুমিই আমার লজ্জাহরণ মধুসূদন, তুমিই আমার অলংকার।'

যে মেয়ে ধরা দেবে না তাকে ধরবে কে। হার মানত জয়নারায়ণ, হার মেনে শ্রান্ত হয়ে যেত একেবারে। কিন্তু যখনই শহরের চৌমাথা দিয়ে দুপাশে নিওন-উজ্জ্বল বস্ত্র বিপণিগুলোর পাশ দিয়ে হেঁটে যেত তখন রঙ বাহারের শাড়ির প্রাচুর্য দেখে মিথ্যা মনে হত বিন্দুবাসিনীকে, মিথ্যে অসম্ভব মনে হত নিজেকে। মনে মনে একটা মিরাকলের কল্পনা করত।

কতদিন রাতে নিজের বুদ্ধি মতো জীবনের সুখ সুবিধেগুলোর মানে বোঝাবার চেষ্টা করত জয়নারায়ণ। সমানাধিকারের নতুন শেখা বুলিগুলি পাখিপড়ার মতো আউড়াতো স্ত্রীর কাছে। হাসত বিন্দুবাসিনী। 'তুমি পুরুষ হয়ে নাকেজলে হচ্ছ। আমি মেয়েমানুষ সেখানে থই পাব না। বাইরে রাস্তায় বেরিয়ে যে গোবর নিয়ে এসে ঘুঁটে বানাব তাও আমার দ্বারা হবে না।' জয়নারায়ণ গুম হয়ে যেত। বিন্দুবাসিনী কাছে ঘনিয়ে এসে বলত: 'রাগ করলে নাকি গো? আমি তোমার গলার পাথর, না ঝেড়ে ফেললে আর তোমার রক্ষা নেই, তোমাকেও গিলে ফেলব।' তারপর গলার স্বর অপূর্ব খাদে নামিয়ে বলত: 'জানো, পালিতদের সেই ধাড়ি বউটা শুনলাম ইস্কুলে ভরতি হয়েছে। ক্লাশ সেভেন-এ।' যেন কত মজার কথা

এই ভাবে বলত বিন্দুবাসিনী। আর তখন গলায় কাঁটা আটকানোর মতো অবস্থা হত জয়নারায়ণের। এত দেখেও এত জেনেও বিন্দুর এই নির্বিবাদে গা-ভাসিয়ে দেবার প্রবৃত্তিটা দুঃসহ ঠেকত। কেন বিন্দু কি নিজেই বলতে পারত না, আমাকে ইস্কুলে ভরতি করে দাও। লেখাপড়ায় যদি ওর মাথা নাই থাকে টুকিটাকি সেলাইও তো শিখতে পারে। কিন্তু, কোনোদিকে এতটুকু চেষ্টা নেই বিন্দুর। নিজের জন্যে শাড়ি-গয়না নাইবা চাইল সে, কিন্তু যেখানে জয়নারায়ণ দু'বেলা দুমুঠো শাক ভাতের জন্যে উঞ্ছবৃত্তি করে বেড়াচ্ছে সেই দিকটার উপরও কি কোনো মমতা নেই বিন্দুর! নাকি সে জানে আধপেটা থাক আর না-থাক তার দেহ অব্যয় অক্ষয় রাখবার মন্ত্র তার অধিকারে। দিনদিন দারিদ্র্যের আগুনে দেহে মনে শুধু জয়নারায়ণই ঝলসে উঠছে, চামচিকের মতো চিমসে হচ্ছে দিনে দিনে, কণ্ঠদেশ আর চোয়ালের হাড় মুখের ওপরে বিপ্রতীপ কোণ সৃষ্টি করছে। না-খেতে পেয়েও স্বাস্থ্য ভরাট রাখবার স্পর্ধায় অহংকারী হয়ে উঠেছে বিন্দুবাসিনী।

সব রাগ মরিয়া হয়ে ফুঁশে ওঠে বিন্দুবাসিনীর অটুট অনন্ত স্বাস্থ্যের জন্যে। মুখ থেকে একটা তেজালো খিস্তি ফেনায়িত হয়ে ওঠে। প্রবল ইচ্ছা জাগে ওকে হিঁচড়ে টেনে রাস্তায় বের করে দিতে আর দূর থেকে দেখতে কেমন লেলিহজিহ্ব শ্বাপদেরা তার দেহকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খায়।

নিত্য ক্ষুধার আগুনে একটা লোক ভেঙে মুচড়ে দুমড়ে যাবে আর একই চন্দ্রাতপের তলায় একটি নারী তার অক্ষয় স্বাস্থ্যের বৈজয়ন্তী উড়িয়ে চলবে—এর মতো নিষ্ঠুর তামাশা আর কি আছে!

আর এতই যদি তোমার স্পর্ধা, বেশ তো ঠেকাও বাইরের জগতের শিলাবৃষ্টিকে, মুদির দোকানের ধার, কিংবা বাড়িঅলার তাগাদা। হয়ত সুফল হতে পারে কিছু। মেয়েদের যৌবনের

দেয়ালে প্রবল ইতিহাস-কুখ্যাত অত্যাচারীরাও প্রতিহত হয়। ফেরাও বাড়িঅলা সাহাকে, ফেরাও মুদির দোকানের বেনীনন্দনকে।

যেন বিন্দুবাসিনীকে সেই পরীক্ষার সুযোগ দেবার জন্যে সেবার পুজোয় আগে অসুখে পড়ল জয়নারায়ণ। যতদিন হেঁটে চলে বেড়াচ্ছিল ততদিন কোর্ট থেকে যাই হক কিছু কুড়িয়ে আনত জয়নারায়ণ। এবার চোখে অন্ধকার দেখল বিন্দুবাসিনী। চিন্তায় ঘন হয়ে এল ললাট।

আর সবচেয়ে মুশকিল হল তাগাদা বাড়ল। এতদিন কোর্টেই চলত। কিন্তু এবার বাড়ি বয়ে এল তাগাদার বন্যা। তোমার স্বামীর অসুখের জন্যে তো আমার বাবার বাৎসরিক কাজ বন্ধ থাকতে পারে না, পারে না পুত্রের অন্নপ্রাশন বন্ধ থাকতে।

দুদিন এল সাহাদের গোমস্তা। কিন্তু তৃতীয় দিন থেকে পাত্র আর আবহাওয়া দুটোই বদলে গেল। তাগাদায় এলেন সাহাদের বি. এ. ফেল ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কনট্রাক্টর ছেলে ব্রজমাধব। এবং টাকা পাওয়ার কোন আশ্বাস পেয়েছিল কিনা জানা নেই তবে আশ্চর্য প্রতিভায় ভাঙা পেয়ালায় এক কাপ চা এগিয়ে দিয়ে বিন্দুবাসিনী তাকে নিরস্তই করেনি, বশ্যতাও স্বীকার করিয়েছিল। রোগশয্যা থেকে জয়নারায়ণ ঘর থেকে শুনতে পেত ওদের কথাবার্তা হাসির ছিটে লাগানো। আর মনে মনে তারিফ করত গেঁইয়া বউটাকে।

অসুখ সারল জয়নারায়ণের। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে না-সারলেই ভালো হত। বিন্দুবাসিনী বেঁকে দাঁড়াল: 'যথেষ্ট হয়েছে। এবার তোমার পাওনাদারদের ঠেকাও তুমি।' আর ঘর থেকে বেরুল না বিন্দু।

জয়নারায়ণ চোখে অন্ধকার দেখল। আর মনে হল এই মেয়ে জাতটাই চরম স্বার্থপর।

ব্রজমাধব রোজ সন্ধ্যায় আসে। কিন্তু নিজের অন্দর থেকে বেরোয়না বিন্দু। এক-একদিন বেরোতে হয় বৈকি। আর কী আশ্চর্য, ব্রজমাধবের সময়ের সঙ্গে জয়নারায়ণের বাড়ি ফেরার সময়টা কিছুতেই মেলে না।

সেদিন ফিরতে একটু দেরী হয়েছিল। বাড়ি অন্ধকার। বিন্দু-বাসিনীকেও নজরে পড়ল না। তারপর মিলল অন্ধকার উঠোনের এক কোণে প্রেতের মতো নিশ্চুপ বসে-থাকা বিন্দুকে। 'কি হয়েছে। অন্ধকারে বসে আছো কেন।' জয়নারায়ণের কাপুরুষ আত্মা ছাঁৎ করে ওঠে।

পাথরের মতো নিশ্চুপ নিস্পন্দ বিন্দু।

তারপর একসময় অশ্রুবিকৃত স্বরে ভেঙে পড়ল সে: 'তুমি থাকতে বাইরের লোক এসে অপমান করে যাবে তুমি তার কোনো প্রতিবিধান করতে পারবে না?'

স্বামীত্বের অহংকার স্ফীত হল জয়নারায়ণের। 'কি ব্যাপারটা কি?'

রাত্রে শুতে এসে সব শুনে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল জয়নারায়ণ। থেমে থেকে মনের মধ্যে চিন্তাগুলো যেন সাজিয়ে নিচ্ছিল সে। কিন্তু স্ত্রীর অপমানে যতখানি বেদনাবোধ পাওয়া উচিৎ, তার কিছুই পেল না জয়নারায়ণ। তোমার শুধু হাত ধরেছে ব্রজমাধব তাতেই অপমানিত বোধ করেছ তুমি। বাইরের জগতে এর চেয়েও কত বড় অপমান আমাদের সহ্য করতে হয়। হাত ধরেছে তাতে অপমানের কি আছে, হাত ধুলেই পরিষ্কার। কিন্তু, আমাদের দিকে চেয়ে দেখেছ। আমাদের আত্মাই বিকিয়ে গেছে। তুমি কাঁদতে চাও, কাঁদো। আমি বাধা দেবো না। তোমার নিষ্কলুষ গ্রাম্যমনের যে অভিমান এখনো ধিকিধিকি করে বেঁচে আছে, সে মন অনেক অশ্রু ঝরাবে। তারপর শহুরে কৃত্রিমতা তোমাকে গ্রাস করবে। তুমি চালাক হবে, চতুর হবে।

অনেক আশ্বস্ত বোধ করল জয়নারায়ণ। জীবনে সমানাধিকার আসে সমান অত্যাচারের মাধ্যমে।

এরপর আরো অনিয়ম হল জয়নারায়ণের বাড়ি-ফেরা। কোর্ট থেকে সোজা চলে যেত বাঁধ রোডে, অফিসার্স ক্লাবে ব্রীজ খেলার আড্ডায় কোনোদিন।

আর বাড়িতে পা দেবা মাত্র দলিত ভুজঙ্গীর মতো ক্রুদ্ধ হয়ে উঠত বিন্দুবাসিনী। স্বামীর এই নিস্পৃহ ভালোমানুষিপনায় জ্বলে উঠত সর্বাঙ্গ। আশ্বস্ত হত জয়নারায়ণ এখন আর বিন্দুবাসিনী কাঁদে না দেখে। যেন ব্রজমাধবের নিত্য হাজিরা তার কাছে উপদ্রব হলেও সহনীয় হয়ে আসছে। এবং অপমান করার দিক থেকে ব্রজমাধব আর কতটা অগ্রসর হয়েছে সবিস্তারে সেটা আর বিন্দু বলত না বলে জয়নারায়ণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মাথা নেড়েছে, ওষুধ ধরেছে। এরপর যত দিন যেতে থাকবে, আরো গোপন করবে বিন্দু, সবটা না বলে মনে মনে জ্বালা কাটতে ভালোবাসবে সে। আর জয়নারায়ণ বাড়ি ফিরলে তুমুল কলহের ভঙ্গি দেখিয়ে নিজের সতীপনার ঘোষণা করবে।

পরদিন সকাল-সকাল ফিরল জয়নারায়ণ। ব্রজমাধব তখন বেরোচ্ছিল।

'একি। এখুনিই চললেন যে। বসুন বসুন। আপনি যখন আসেন তখন তো আমি বাড়িতে থাকতেই পারিনে।' তারপর একটু হেসে। 'কি জানেন সাহামশায়, আপনাদের মতো সদাশয় ব্যক্তিরা আজো সংসারে আছেন বলেই আমরা গরিবরা একেবারে লোপ পেয়ে যাইনি।'

'না। আজ আর বসব না জয়নারায়ণ বাবু।' ব্রজমাধব বললে পা বাড়াতে বাড়তে।

জয়নারায়ণ পেছন থেকে গলা উঁচিয়ে বললে, 'কালকে একবার আপনার ওখানে যাব।'

'কেন?' সন্দিগ্ধ গলা ব্রজমাধবের। তারপর হাসি টেনে বললে: 'বেশ তো যাবেন। হ্যাঁ দেখুন জয়নারায়ণ বাবু কথাটা ভাবছি অনেক দিন থেকে। বাড়িটার যা অবস্থা দেখছি না সারালে আর চলে না। আপনি মিস্ত্রি লাগিয়ে সারিয়ে নিন। ভয় নেই টাকা আমি দেবো।'

জয়নারায়ণ হাসল।

পরের দিন কোর্ট ফেরত একটা বড় ইলিশমাছ নিয়ে ফিরল জয়নারায়ণ।

'ব্যাপার কি? হঠাৎ আলাদিনের পিদিম পেলে নাকি?' বিন্দুবাসিনী সন্দেহ ভরা গলায় জিগ্যেস করল।

জয়নারায়ণ হাসল। 'না। ব্রজমাধববাবু বাড়ি সারানোর জন্যে কিছু টাকা দিলেন।'

'তুমি—তুমি ওর কাছ থেকে টাকা নিলে।'

'হ্যাঁ। নিয়েছি তো।'

'নিয়েছ!' দাঁতে দাঁতে এঁটে তীক্ষ্ণ গলায় বিন্দুবাসিনী বললে: 'জানো এ টাকা নেয়ার মানে কি।'

'জানি বৈকি। তুমিও তো জানো।'

'তোমার জ্বালায় আমার গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করছে।'

'কিন্তু তুমি তা দিতে পারবে না।' হাসল জয়নারায়ণ: 'বাজে কথা বাড়িয়ে লাভ কি। যাও মাছ রান্না করো গে।'

'আমি পারব না। যা খুশি করো, পারব না আমি। তুমি মানুষ না পশু। একটা লোভী নোংরা লোকের হাতে তোমার স্ত্রী সম্মান···'

'লোভ তো আমারও আছে বিন্দু, নাকি স্বামী-দেবতা বলে আমার সব কিছু গঙ্গা জলে ধোয়া···' মনের মধ্যে কৃমির মতো পুরানো চিন্তাটা খলবলিয়ে উঠেছিল: ভোগ্য হওয়া ছাড়া যে রমণীর

শরীরের আর অতিরিক্ত কোনো অর্থ নেই, তাকে স্ত্রী ভাবা যায় না। জননী হওয়া ছাড়া নারীত্বের অন্য গৌরব নেই।

বোধহয় সত্যি সত্যি কূয়োর গভীরে ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়েছিল বিন্দু ক্ষিপ্র হাতে ওকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল জয়নারায়ণ। ঘরে এনে ছুঁড়ে ফেলে দিল বিছানার ওপর।

সারা রাত জেগে পাহারা দিল জয়নারায়ণ। ব্রজমাধবের সঙ্গে পাকা চুক্তি করে এখন কূলে এনে তরী ডোবাতে চায়না সে। পৃথিবীতে কোনটা পাপ কোনটা পুণ্য কে বলবে। বাঁচার মতো সত্য পবিত্র জিনিস কিছু নেই। পৃথিবীতে একটা মানুষকে আজ তুমি কল্পনা করতে পারবে যে তার আত্মাকে বিক্রি করেনি! তবু মানুষ বাঁচে, বাঁচে বাঁচার প্রলোভনে।

এ নিয়ে নাটক করার প্রবৃত্তি নেই জয়নারায়ণের। বাঁচার মতো পদার্থটা আর যাই বলো নাটকীয় নয়। কেউ হাত খাটিয়ে, কেউ পা লাগিয়ে, কেউ মাথা খরচ করে বাঁচে। তোমার হাত নেই পা নেই, মাথা নেই, তুমি পৃথিবীর আদিমতম প্রাণী অ্যামিবা বিশেষ, তারাও আকারহীন দেহের নানা কসরত করে খাদ্য জুগিয়েছে। তোমার যদি দেহ থাকে সেই দেহ খাটিয়েই তোমাকে খাদ্যের শিকার করতে হবে।

পরদিন দুপুরে কোর্টে বেরুবার সময় শোবার ঘরে বিন্দুকে চাবি বন্ধ করে চলে গেল জয়নারায়ণ।

সন্ধ্যে ডিঙিয়ে চাবি খুলল ব্রজমাধব।

পার্কের ধারে সেই কৃষ্ণচূড়া গাছটার নিচে বসে বসে তখন জয়-নারায়ণ আশেপাশে জীবন দেখছে, আকাশ দেখছে। দু' পয়সার চিনেবাদাম চিবোতে-চিবোতে অনেক ছেলেবেলার অনেক স্মৃতি কি জানি কেন উথলে উঠল মনে। দাঁত দিয়ে চিনে বাদামের খোশা ভাঙতে-ভাঙতে তার চোয়ালের হাড়দুটো বিকট ভাবে ঠেলেঠেলে উঠছে।

তারপর রাত্রির ঘন অন্ধকারে সমস্ত পার্ক নির্জন হয়ে এলে পর

বাড়ি ফিরবার প্রেরণা বোধ করল জয়নারায়ণ। সারা দিনের থিতানো উত্তেজনায় তখন পকেটকাটা অসামাজিক জীবের মতো পলাতক হয়ে উঠেছে মনের রাজ্য।

অন্ধকারের পরদা মুড়ে বাড়িটা জাঁতাকলে আটকানো ইঁদুরের মতো নিশ্চুপ। দরজা ঠেলে নিঃশব্দ পায়ে ভেতরে ঢুকল জয়নারায়ণ। কোথাও কোন শব্দ নেই সাড়া নেই। কেরাসিনের বাতিটা অনেকক্ষণ জ্বলে জ্বলে ধোঁয়ায় দুর্গন্ধ সৃষ্টি করছে। শোবার ঘরটা আরো নির্জন, নিস্তব্ধ। ঘরে উঁকি মারতে গিয়ে হঠাৎ অন্ধকারে ধাক্কা লেগে দৃষ্টি ফিরে আসে জয়নারায়ণের। 'বিন্দু!' মুখ থেকে হিসহিসে একটা ধ্বনি অন্ধকারকে চূর্ণ করবার চেষ্টা করল। হঠাৎ ম্যালেরিয়া রুগীর মতো সর্বশরীরে কেমন কাঁপুনি জাগল, শির শির করে উঠল দাঁত, একটা অবয়বহীন বিভীষিকা যেন পাকে পাকে জড়িয়ে ধরতে চাইল তাকে। লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘর থেকে ছিটকে এল জয়নারায়ণ। গলির মোড়ে কখন থেকে একটা কুকুরের বাচ্চা ককিয়ে চলেছে, বোধ কোনো লরী থেঁতলে দিয়ে গেছে ওর নিম্নাঙ্গ। সারা রাত্তির বাইরের ঘরে মশার কামড়ে ঘুম এল না জয়নারায়ণের। একটা অস্বস্তিকর অবস্থা, হয়তো কখন আলুথালু বেশবাস মুক্তকেশী বিন্দুবাসিনীর আবির্ভাব ঘটবে। রাত্রির অস্পষ্ট অন্ধকারে ওর দৈহিকতার চড়া উপস্থিতি সহ্য করতে পারবে না জয়নারায়ণ।

যে-নতুন পরিস্থিতিকে কেবলমাত্র বাঁচবার হাতিয়ার ভেবেছিল জয়নারাণ তারও যে একটা মানসিকতার দিক রয়েছে, সে বিষয়ে মাথা ঘামায়নি সে। এখন মাথা ঘামাতে গিয়ে অনেক পরিশ্রমে যেন মাথা ছিঁড়ে যেতে লাগল তার।

দিনের বেলা যখন গৃহলক্ষ্মীর নিপুণ হাতে বিন্দুকে ব্যস্ত থাকতে দেখত, পরিপাটি করে রেঁধে বেড়ে, এমন কি হাতের কাছে কোট ছাতা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে, ওর সদ্য স্নান করা পিঠের ওপর ভিজে

চুলের রাশ আর সিথেঁয় টকটকে সিঁদুরের রেখায় কিছুতেই ভাবতে পারত না জয়নারায়ণ দিনের আলো মুছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ মেয়ে বদলে যাবে। কী আশ্চর্য গুণে দিন আর রাত্রির জীবনপর্বকে পুরু বেড়া দিয়ে ভাগ করে রেখেছে বিন্দু।

তারপর জয়নারায়ণের বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনেই কেমন দ্রুতলয়ে বদলে গেল বিন্দু। যে মেয়ে বাড়ি থেকে বেরোতে ভয় পেত সেই বিন্দুই এখন নিজে মার্কেটিঙে বেরোয়। টুকিটাকি সাংসারিক প্রয়োজনে স্টেশনারি দোকান চষে ফেলে সে। দেখে শুনে একটা রঙিন ছাতা কিনেছে, শাড়ি মিলিয়ে জুতো আর জয়পুরী ভ্যানিটি ব্যাগ, এমন কি কালো চশমাটা কিনতেও জয়নারায়ণের সাহায্য নেয়নি বিন্দু।

পারো তুমি এ মেয়ের কোন দোষ দিতে। আদর করে স্বামীকে খাওয়ানো থেকে কি চওড়া করে সিঁদুর পরতে কোনোদিকে কোনো ত্রুটি নেই। পর্যন্ত একদিন বোম্বে ফ্রেমে বাঁধিয়ে আনল জয়নারায়ণের যৌবনের একটি ফোটো। ধূপ দিলো ধুনো দিলো আর মোটা গাঁদা ফুলের মালায় জড়িয়ে রাখল ফোটোটা।

দেখে শুনে থ বনে যায় জয়নারায়ণ।

এদিকে পাড়ার যতসব উৎসাহী টাউন ক্লাবের খেলোয়াড় কি হবু কবি কি ব্যায়াম সংঘের দেহশ্রী সকলের মধ্যমণি হয়ে উঠল বিন্দু-বাসিনী। সতেরো থেকে পঁচিশ বছরের তরুণ আর নব্যযুবক। তাদের সঙ্গে চিনেবাদামের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কি পাঁপড় ভাজা চিবোতে চিবোতে কোনো বিষয়েই বিন্দুর মতবাদ দিতে আটকাল না। সময় অসময় নেই, তাদের সঙ্গে বিস্তি খেলতে কি লুডো খেলতে খেলতে হেরেও বিন্দুর উচ্চকিত হাস্যের বিরাম নেই। বাড়ির মধ্যে নিজের আর একটা বাড়ি গড়ে তুলল বিন্দু। আর যত রাত করেই ফিরুক জয়নারায়ণ আড্ডা থাকবেই বাড়িতে। ফলে নিজ বাসভূমে পরবাসী হল জয়নারায়ণ।

স্বামীত্বের অহংকার মাঝে মাঝে গর্জে উঠতে চায়। প্রতিজ্ঞা করে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে। কিন্তু অবাক হয়ে যায় বিন্দুর কথা শুনে: 'ছিঃ, তুমি না স্বামী, সাত-তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে তোমার অধিকার নাইবা এমন করে জাহির করলে।'

ক্লান্ত শ্রান্ত জয়নারায়ণ তস্করের মতো আবার রাস্তায় নামে। বড় বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলছে নাকি বিন্দুবাসিনী! অনেক রাতে ফিরে এসে সাবধান করতে ইচ্ছে করে বিন্দুকে। কিন্তু বিন্দুর তখন রাত দুপুর, ঘুমে পাথর। আজকাল আলাদা ঘরে শোয় বিন্দু। জয়নারায়ণের ঘরে নিত্যকার মতো টেবিলে খাবার চাপা থাকে। রাত্রির এ বন্দোবস্তটা জয়নায়ায়ণের করা। থালায় খাবার সাজানোর ব্যাপারে বিন্দুর কোনো ফাঁকি নেই। কিন্তু তবু খেতে বসে মন উদাস হয়ে যায় জয়নারায়ণের। একটা নিরেট বিষণ্ণতা বুকের উপর পাষাণভারের মতো মনে হয়!

সেদিন সকালে বিশ্রী অবসাদ নিয়ে ঘুম ভাঙল জয়নারায়ণের। তার মুখ দেখলে যে কোন দর্শক মনে করতে পারত: লোকটার সর্বস্ব চুরি গেছে। এমনি সর্বরিক্ত দেখাল জয়নারায়ণকে। হঠাৎ জ্ঞান হল তার: সে হেরে গেছে। জীবনের হাটে পকেট মারতে গিয়ে আজ মনে হল জীবনই তার পকেট মেরে নিঃস্ব করে দিয়েছে। কিন্তু না একবার শেষ শেষ চেষ্টা করে দেখবে সে। যদি পালিয়ে যায় বিন্দুর হাত ধরে অন্য কোনো শহরে কিংবা গ্রামে। না। বিন্দু যেখানেই যাবে সেখানেই শহর বানাবে।

'বিন্দু—'

'কি বলছ?'

বিন্দুর উদ্ধত শারীরিকতার সামনে সমস্ত চিন্তা গোলমাল হয়ে গেল জয়নারায়ণের। অব্যয় অক্ষয় বিন্দুবাসিনীর শরীরের ওপর দৃষ্টি আটকে গেল জয়নাবায়ণের। চোখ দুটি যেন হাঁ হয়ে গিলতে চাইল

বিন্দুকে। সেই দৃষ্টিবাণে জর্জরিত হয়ে বিন্দু ছটফট করল না, থমকে দাঁড়িয়ে রইল। মস্তিষ্ক বেয়ে একটা উষ্ণ স্রোতের ধারা টগবগ করে তুলল জয়নারায়ণের রক্তে। জয়নারায়ণ বললে, 'আজ আর কোনো অতিথি নয়। বলো, চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকো না, কথা দাও—'

'বেশ তো।' বিন্দু লঘুহাস্যে জবাব দিল।

খেয়ে দেয়ে কোর্টে বেরুল জয়নারায়ণ। অনেক সুস্থির লাগছে নিজেকে। স্বামীত্বের অধিকার থেকে তাকে একেবারে যে নির্বাসিত করেনি বিন্দু এইটে ভেবেই তার উদ্বেগ দূর হল। সারাদিন একটি কথাই গুণ গুণ করে ফিরল জয়নারায়ণের মনে। বিন্দু সম্পর্কে ভুল ভেবেছে সে। জয়নারায়ণ যদি ওকে দূরে সরিয়ে না দিত সে কিছুতেই দূরে যেত না। স্ত্রীত্বের গৃহপালিত মায়া এখনো সুকুমার রেখেছে বিন্দবাসিনীর মুখ। আজকের রাত তাদের স্বামীস্ত্রীর। কোনো অতিথি নয়, কোনো বাইরের লোক নয়। যে পাঁচিল গড়ে উঠেছে দুজনের মধ্যে সে ব্যবধান আজ ঘুচবে। জীবন সম্পর্কে যে নৈরাশ্য এতদিন পীড়িত করেছিল জয়নারায়ণকে, আজ মনে হল সে-সব তার মন গড়া ভাবনা। আজ হঠাৎ উপলব্ধি হল: বিন্দুবাসিনীকে সে কী-গভীর ভালোবাসে। কথাটা জেনে খুশি হল জয়নারায়ণ।

ফেরার সময় মার্কেটে গিয়ে দুটো বেলফুলের মালা কিনে ফেলল সে। নরম মমতার সঙ্গে গন্ধসমেত মালা দুটো আলতো করে কোটের পকেটে ফেলে রাখল। পথে বিখ্যাত বাদশাহী পানের দোকানটায় দাঁড়িয়ে দুখিলি মিষ্টি পান কিনল। এবার বাড়ি। বাড়ির কাছাকাছি আসতে কেমন দুরন্ত লজ্জা মিশ্রিত পুলকে ঢিপঢিপ করে উঠল বুকটা। অতি পুরানো শ্বশুর বাড়ির একটা স্মৃতি হঠাৎ মনে পড়ল তার। নিজের মনেই হাসল জয়নারায়ণ। মাথা নেড়ে খুশির ভান করল।

কথা রেখেছে বিন্দুবাসিনী। অনেক দিনের মতো আজ বাড়িটা

নিঃসঙ্গ আতুর হয়ে যেন কেবলমাত্র তারই প্রতীক্ষা করছে। বিন্দুকে দেখে আরো অবাক হল। তোরঙ খুলে পুরনো মুর্শিদাবাদী সিলকের শাড়ি বের করে মানানসই জামার সঙ্গে পরেছে। সিঁথের উজ্জ্বল সিঁদুর, কপালে খয়েরী রঙের টিপ, কবরী বেঁধেছে পরিপাটি করে, ঠোঁটে হালকা রঙের পালিশ করেছে কিনা বোঝা গেল না, কাজল টেনেছে দীর্ঘ করে, গভীর দীঘির হাতছানি কটাক্ষে।

খাবারের জায়গা করল বিন্দু নিজের হাতে। যতক্ষণ খেল জয়নারায়ণ বসে রইল পাশে। সোহাগে থৈ থৈ বন্যা ছুটেছে আজ রাত্রিতে। অতিরিক্ত খেয়ে ফেলল জয়নারায়ণ। তারপর বিন্দুবাসিনীকে খাবার সময় দেবার জন্যে বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এল সে। আকাশে নক্ষত্রের আসর, চাঁদ ঠায় আটকে রয়েছে পত্র-বিহীন মুড়ো নারকেল গাছটার মাথায় আর অজস্র হাওয়ার দাক্ষিণ্য।

বড় দেরি করছে বিন্দুবাসিনী। শোবার ঘরে বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে পান মুখে অপেক্ষা করতে লাগল জয়নারায়ণ। বেলফুলের মালা দুটো রাখল বালিশের পাশে।

অত্যধিক ভোজনে শুয়ে শুয়ে বোধ হয় ঘুম আসছিল জয়নারায়ণের। মশারা একযোগে ব্যাগপাইপ শুরু করেছে। হাই তুলল সে। তুড়ি দিয়ে আলস্য কাটাবার চেষ্টায় পা ছড়িয়ে শুল। দূরে ঘড়িতে নটার ঘোষণা।

ধড় মড় করে উঠে পড়ল জয়নারায়ণ। বিন্দুবাসিনী এত দেরি করছে কেন। তার রাতের কাজ কি শেষ হয়নি। বিয়ের প্রথম -প্রথম এটা সেটা কাজে অকাজের অজুহাতে ঘরে আসতে তার প্রায়ই দেরি হত। জয়নারায়ণের বকুনির ভয়ে বলত: আমার লজ্জা করে। তবে আজও কি লজ্জা করছে বিন্দুর।

পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে এল জয়নারায়ণ।

পাশের ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল জয়নারায়ণ। দরজায়

হেলান দিয়ে স্থির ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বিন্দুবাসিনী। চোখের তারা-দুটো চকচক করছে হিংস্রের মতো। শরীর দিয়ে ঢোকার পথটা আটকে রেখে জয়নারায়ণের মুখে ওর পাথরের মতো শক্ত কঠিন দৃষ্টি আটকে গেছে। আর ওর চোখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে জয়নারায়ণের লক্ষ্য পড়ল বিন্দুর প্রসারিত হাতের ওপর, যেটা চিত হয়ে থেকে জয়নারায়ণকে নগদ প্রাপ্তির কিছু ইংগিত করছে।

চিৎকার করতে পারল না, যন্ত্রণায় ফেটে পড়ল না তার মস্তিষ্ক জয়নারায়ণ ভূমিকম্পের পতনের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করবার জৈবিক তাড়নায় আঙুল দিয়ে সজোরে জড়িয়ে ধরল দেয়ালটাকে।

সপ্তর্ষি শারদীয় ১৩৬৫

শতাব্দীর শব

রেডিয়োতে একটি বিলিতি বাজনা বাজছিল। কোনো শিল্পী যদি সেই গানটির ছবি আঁকতেন তা হলে দেখা যেত একটি উত্তাল-তরঙ্গক্ষুব্ধ সমুদ্র আর তার তলায় ধাবমান মুমূর্ষু সিন্ধু-সারসের কাকলী। নিঃশব্দ কক্ষে ওই গানটি আবহ-সংগীতের কাজ করছিল। ছোট্ট গোল টেবিল, তিনটি চেয়ারে তিনটি স্তব্ধ মূর্তি। গৃহস্বামী অরুণোদয় চ্যাটার্জি, তাঁর স্ত্রী তপতী এবং পরিবারের বন্ধু গৌতমী রায়। ইলেকট্রিকের দুধ-শাদা বাল্‌বের আলোয় সমস্ত ঘরে জ্যোৎস্নার ভিজে স্নিগ্ধতা। মাথার ওপর মাঝারী সাইজের নতুন ফ্যানটা অজস্র হাওয়ার খুশি ছড়াচ্ছিল। টেবিলে উষ্ণ কফির পাত্র গন্ধ এবং ধোঁয়ার অস্তিত্ব তুলে গ্রহণের প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছিল। সময় সন্ধ্যা। বাইরে এক মশলা বর্ষণের পর আবার গুমোটের বাষ্পে ছেয়ে গেছে। পাখার হাওয়া গুমোটের জট ছাড়াবার চেষ্টা করছে। চেয়ারের তিনটি প্রাণী কেউ নড়ছে না, নড়ছে না অনেকক্ষণ থেকে। যেন কোন্ চিত্রকরের আদেশে স্থাণুর মতো তারা বসে রয়েছে। বোধকরি নিশ্বাসও পড়ছে না। নাঃ প্রাণের কোনো লক্ষণও নয়। কারণ তাহলে অস্তিত্ব মুখর হবে। এবং সেটা কারুর পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়।

তপতীর মস্তিষ্ক: (বয়স ত্রিশ, ভারি গড়ন, কোমল শ্যাম বিদুষী, কোনো কলেজের দর্শনের অধ্যাপিকা।) আমি জানতাম এমন হবে। জানতাম! অনেক দিন থেকেই আমার মনে হয়েছে। কিন্তু

মনকে পীড়িত করতে পারিনি। কারণ তাতে মন ছোটো হয়। আমি ছোটো হতে পারিনি, পারি না। আমি শিক্ষিত, ভদ্র সংস্কৃত আমার মন, গ্রাম্য স্ত্রীলোকের মতো সেখানে এক ফালি সন্দেহের ছায়া আমি ফেলতে পারিনি। কারণ সেটা আমার হার, আমার অহংকারের পতন। অরুণোদয়কে আমি বিশ্বাস করেছি, এখনও করি। এই দশ বছরেও যদি তাকে না চিনতে পেরে থাকি, সে-লজ্জা আমার। তাকে আমি পরিপূর্ণ করে ভরে রেখেছি কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই যে বাইরের জলো হাওয়া ঢুকে তার মনের স্বাস্থ্যকে হরণ করবে। ও আমাকে যখন যেভাবে চেয়েছে পেয়েছে। আমি নিজের সত্তাকে গলিয়ে দিতে পেরেছি ওর প্রয়োজনের তাগিদে। ওকে আমি পরিচ্ছন্ন ঘর দিয়েছি, নিরাপত্তা দিয়েছি, ওর কাছে আমি কখনো ভার হইনি। অরুণোদয়ের সন্তানকে আমি গর্ভে ধারণ করেছি, ওর সন্তানের আমি মা, স্ত্রীর গৌরব আমার সবশরীরে, শোণিতে, স্পন্দনে। আমার সঙ্গে ওর ব্যবহার নির্ভুল, নিখুঁত। আমাদের বিবাহ-বার্ষিক সে ঠিকই মনে রাখে, এমনকি আমার জন্মের তারিখটি পর্যন্ত। প্রাতদিনের চলাফেরার ভেতরে অরুণোদয় কখনো বেহিসেবী হয়নি। বাড়ির প্রতি ওর টান প্রবল, আপিসের কাজটুকু ছাড়া সে বাড়িতেই আত্মগোপন করে থাকতে ভালোবাসে। ওর বন্ধু বলতে কেউ নেই। হ্যাঁ আমিই ওর বন্ধু, সারা দিনের জমানো আবেগ সে আমার কাছেই মুক্ত করে। ওকে আমি ছাড়া আর কে এত বেশি বোঝে! এতদিন হয়েছে তবু ও আড়ষ্ট, মুখচোরা। স্বামীর চেয়ে ওকে প্রেমিক-রূপে মানায়। আমার মতো কে ওকে এত বেশি বোঝে! এমন ছেলেমানুষি করে! আমার কলেজ থেকে ফিরতে দেরি হলে কিংবা রাত্রের পাট চুকিয়ে শোবার ঘরে আসতে। আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে প্রণয়ীর মতো, আমি শ্রাবণে জন্মেছি বলে, শ্রাবণী বলে ডাকে। ওর কাছে দাম্পত্যজীবন একখণ্ড লিরিক কবিতার মতো।

আমাকেও কেমন আবিষ্ট করে রাখে। ওর কাব্য আমাকে কাঁপায়, আমাকে চঞ্চল করে, শিহর জাগায় রক্তের প্রবাহে। ওর এই ছেলে-মানুষিকে আমি প্রশ্রয় দিয়েছি, ওকে শিশুর মতো লেগেছে। তবু কেমন নেশা আছে ওর মধ্যে। নতুন নতুন করে জীবনকে আস্বাদ করা।

তবু বলব ওর এই আবেগের মধ্যে ভয় ছিল না এতদিন। কারণ ওর দেয়া স্পর্শানুভূতির গভীরে আমি অতল মনের নাগাল পেতাম না। মনে হত এই ভালো। এই স্পর্শ, এই স্পন্দন, এই রঙ এই উত্তেজনা। কিন্তু, এক-এক সময় মনে হত এটা স্বাভাবিক নয়, ঘোরঘোর অবস্থা। যেন জীবনের ব্যাকরণ নেই এর মধ্যে। ওটা শুধু স্পর্শস্পন্দন-রঙ-উত্তেজনা জড়ানো একটা অন্য কিছু বস্তু। এবং সে বস্তুটিকে ব্যাখ্যা করলে কিছু পাওয়া যাবে না। অবাস্তব, একটি খেয়াল মাত্র। আমার ভয় হত। ভয় হত একটা দুর্বোধ্য জিনিসের সঙ্গে ঘর-করার মতো। অরুণোদয়কে ঘিরে আমার একটা ভয়ের জাল গড়ে উঠল। সে-জালকে ভেদ করি সে-সাধ্য আমার ছিল না।

সে-ভয়টিই কি আজ সত্য হল। এবং তার রূপটি এত প্রচণ্ড, বিহ্বলকরা। আমি ভাবতে পারছিনে, কিশোরী বেলায় শাড়িকে কায়দা করবার চেষ্টায় হিমসিম খেয়ে ওঠার মতো একটা ভাব আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে দিচ্ছে। আমি ভাবনাগুলিকে গুটোতে পারছিনে, তারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাচ্ছে। আমি কি ভাবব, কেমন করে ভাবব। আমি সাংঘাতিক ধরনের কিছু ভাবতে যাচ্ছি—কিন্তু পারছিনে। আমি তো জানতাম, অনেক দিন থেকেই আঁচ করছিলাম: একটা কিছু হতে যাচ্ছে। নিশ্চিত ধারণা করেছিলাম একটা কিছু হতে যাচ্ছে—আমার মন চাইছিল একটা কিছু হোক। পুরনো বিপজ্জনক স্টোভটা একদিন বিস্ফোরিত হয়ে পড়ুক, আমার আর সহ্য হচ্ছিল না। বিস্ফোরিত হল এবং আমারই চোখের সামনে! আমি নিশ্চিন্ত হলাম, আমার এতদিনকার উদ্‌বেগ শান্ত হল। একটা পীড়ার হাত

থেকে আমি বাঁচলাম। কিন্তু, এখন আমি কি করব। আমি এখন থেমে থাকতে পারিনে, কারণ আর চিন্তার অবকাশ নেই, চিন্তা দূর হয়েছে। এখন আমাকে কিছু করতে হবে।

আমি নতুন মুন্সেফ হয়ে এসেছি এজলাসে, আমার সামনে নতুন মামলা। আমি বিচারক! রায় দিতে হবে। অরুণোদয় গৌতমী—ওরা দাঁড়িয়ে আছে আসামীর কাঠগড়ায়। কিন্তু আমার বিচার করে কে। বিচারকেরও বিচার আছে। আমি, আমার অন্য-সত্তাকে কোনো দিন সম্মানের সঙ্গে তুলে ধরিনি। আমি আত্মনাশকেই আত্মসম্মান ভেবেছিলাম। কোনোদিন ওকে জানতে দিইনি আমিও একটি ব্যক্তিত্ব, যার বিচার-বিবেচনা আছে। যে চোখ খুলে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করতে ভালোবাসে। আমি চোখ খোলা রাখিনি, অন্যের চোখ দিয়ে আমি সংসারযাত্রা নির্বাহ করে চলেছিলাম। আমি দশ বছরের জীবনে কোনোদিন রাগিনি, বিরক্ত হইনি। অরুণোদয় আমাকে নিরুপদ্রব নির্জীব মেয়েমানুষ ভেবেছিল। আমি শীতের দিনের লেপের মতো স্বাভাবিকভাবে জড়িয়েছিলাম ওর দেহে। আমি নিজেকে দামী করতে পারিনি, তাই দাম পেলাম না, অল্পমূল্যে বিকিয়ে গেলাম সংসারের হাটে।

কিন্তু ওদের বিচার আমাকে আজ করতেই হবে। ওরা আমাকে ঠকিয়েছে, আমার বিশ্বাসকে অপহরণ করেছে। আমি শক্ত-কঠিন দৃষ্টিতে তাকাতে চাইলাম ওদের দিকে। কিন্তু ওদের মুখ দেখতে পেলাম না। আমার চোখের দৃষ্টি কেমন ঝাপসা আর ঘোলাটে হয়ে এসেছে। আমি চোখের সামনে শাদা দেয়াল ছাড়া কিছু দেখতে পারলাম না। আমি কি বলব ওদের, কী বলতে পারি। ওদের অপরাধ তো আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। ওরা অপরাধী। এখন আমার রায় কি হবে? অরুণোদয় তুমি প্রস্তুত হও। তুমি জানো: আমার বাড়ির প্রচণ্ড বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও কেবল ভালোবাসার জোরেই আমি তোমার হাত

ধরে বেরিয়ে আসতে পেরেছি। তোমাকে আমি নিরাপত্তা দিয়েছি, আর্থিক সহায়তা। এখন আমার বাড়ির লোক কি বলবে, ওদের কাছে আমাকে কি অবস্থায় ফেললে। তুমি জানো আমার কলেজের কলিগ্‌রা আমাকে সম্মান করে, শ্রদ্ধা করে, আমার এ-দশা দেখলে তারা আমাকে কৃপাকটাক্ষ করবে। আমার সামাজিক সম্মান আমার কাছে বড়। কারণ আমি সামাজিক জীব। আমার সামাজিক প্রতিষ্ঠাকে এইভাবে ধূলিসাৎ করে দেবার কোনো অধিকার তোমার নেই। তাছাড়া—আমাদের সন্তান তার কাছে তোমার কি পরিচয় আমি দেবো। সে জানবে তার বাবাকে, জানবে তার পরিবারকে, এবং সে মুহূর্তে সামাজিক বন্ধনের পবিত্রতাকে সে সন্দেহের চোখে দেখবে, তার সুস্থ সুন্দর বিশ্বস্ত জগৎ এক লহমায় ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে।

আমি এখন আর নিজের কথা ভাবছিনে। নিজের কথা ভাববার এ সময় নয়। আমার চোখের সম্মুখে সমস্ত জগৎটা দুলে উঠছে। আমি কোন ব্যক্তি নয়, আমি প্রফেসার চ্যাটার্জী, মিসেস চ্যাটার্জি, আমি মা, আমি সংসারী মেয়ে। এগুলিকে আমি সবসময় বড় করে দেখেছি। এগুলিই আমার আভরণ আমার সম্পদ। এর একটিও গেলে আমি সর্বস্বান্ত হব, রিক্ত হব।

আমি আজ বুঝতে পারছি জীবন ছন্দ নয়, স্পন্দন নয়, রঙ নয় উত্তেজনা নয়, জলের মতোই জীবনের কোনো রঙ নেই, সে স্বাভাবিক, সহজ। অরুণোদয়, তুমি কি বুঝতে পারছে কী ক্ষতির কালিমা তুমি আমার—আমাদের জীবনে টেনে আনলে। তোমার চুরি-করা আবেগকে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে তুমি কি একবারও ভাবোনি ভবিষ্যতের চেহারাটা? সংসারটা একটা সুগ্রথিত মালার মতো, তার একটি ফুল ছিঁড়ে গেলে, সমস্ত মালাটাই খুঁতগ্রস্ত হয়ে ওঠে।

অরুণোদয় আমি তোমাকে শাস্তি দেবো। কিন্তু তার আগে আমি তোমার বক্তব্য শুনতে চাই। ছাখো আমি একটুও উত্তেজিত

হইনি, আমি ঠাণ্ডা মাথায় তোমার কথা শুনব। বলো, বলো তুমি অরুণোদয়।

অরুণোদয়ের মস্তিষ্ক : (বছর পঁয়ত্রিশ, স্বাস্থ্যবান যুবক, গৌরবর্ণ, উচ্চপদস্থ সরকারী চাকুরে।) এই জীবনকে আমি কোনোদিন বুঝিনি। জীবনটা আমার কাছে চিরকালই দুরূহ অঙ্কের মতো দুর্বোধ্য লেগেছে। ফলে আমি নিজস্ব একটি ভঙ্গি সৃষ্টি করেছিলাম। কলেজ জীবনের অমানুষিক দারিদ্র্যের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে আমাকে একটা ধার-করা বর্ম পরতে হয়েছিল। সিনিসিজমের আড়ালে আমি পলায়ন করতে চেয়েছিলাম। এটা একটা নকল বীরপণা! আমার জীবন-স্রোত এগিয়ে গেল হোঁচট খেতে-খেতে। মনে হল জীবনটা একটা আকস্মিকতার মালা-গাঁথা ছাড়া কিছু নয়। আমি নিজের চেষ্টায় কিছু করিনি। তপতীর সঙ্গে যোগাযোগ আমার কলেজ জীবনের শেষ পর্বে। আমি ওকে ভালোবাসি কিনা বোঝবার আগেই প্রেম নিবেদন করে বসলাম। আর তপতী আমাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করল। সমস্ত ব্যাপারটা এমন ক্ষিপ্র এবং হঠাৎ ঘটে গেল যে আমি বাধা দিতে পারলাম না, আমার জীবনভঙ্গির সঙ্গে কেমন খাপ খেয়ে গেল।

আমি ঘর পেলাম, নিরাপত্তা পেলাম। কিন্তু কোনোদিনও মনে হয়নি এর জন্যে আমি দাম দিয়েছি এবং দাম দেয়ার অবকাশও আছে। এ যেন আমার স্বাভাবিক পাওনা। একেক দিন আমার এ সন্দেহও হয় এ ঘর আমার কিনা, আমি এ সংসারের সত্যিই প্রভু কিনা, নাকি অতিথিমাত্র। আগেই স্বীকার করেছি আমার জীবনবোধের পায়ের তলা কোনদিন মাটি ছিল না। কাজেই দাম্পত্য জীবনের আদল আমার কাছে কিছু রঙ কিছু উষ্ণতা কিছু স্পন্দন আর উত্তেজনার বাষ্পে হারিয়ে গেল। তপতী, আমার স্ত্রী, বিয়ের পর থেকে মা হাওয়া পর্যন্ত কোনোদিন একটা শরীরী মূর্তিতে ফুটে উঠেছে কিনা

আমার সন্দেহ। তপতী আমার কাছে রঙ-উষ্ণতা-স্পন্দন-উত্তেজনায় তালপাকানো একটা পদার্থ ছাড়া-কোনোদিনই কিছু হতে পারেনি। সে যে একজন শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মহিলা, তারও বাহির জীবনে অনেক সমস্যা আছে—সে-চিন্তা কোনোদিন আমার মনে উদয় হয়নি।

সেজন্যে আমাদের সম্পর্কটা বিশেষ এক জায়গায় থেমে গিয়েছিল, আর এগোয়নি। আমার এখন ভাবতে অবাক লাগছে তপতীর জীবনের অনেক ঘটনাই আমি স্মরণ করতে পারিনে। কোন্ ইয়ারে সে এম. এ. পাশ করেছে, ফার্স্ট ক্লাশে কত পজিশন, কলেজে সে কত মাইনে পায়, ইউ জি সি'র টাকা পাচ্ছে কিনা, ওর জীবনের এমন ধরনের সমস্যাগুলি সম্পর্কে আমার অজ্ঞানতা অগাধ পরিমাণ। এমনকি এসব ব্যাপারে আমার অনাগ্রহ বিস্ময়কর।

তা সত্ত্বেও আমাদের দাম্পত্য জীবন-প্রবাহে বিন্দুমাত্র ভাটা পড়েনি। একজন পুরুষ স্ত্রীর কাছে যা আশা করে তার বেশিই আমি পেয়েছি। তপতী আদর্শ স্ত্রী, রত্নবিশেষ, যে কোন পুরুষ তাকে স্ত্রী হিসেবে পেলে গর্ব অনুভব করবে। আমিও যে স্ত্রীগর্বে গর্বিত নই, এমন নয়। কিন্তু পৃথিবীতে এক-একজন মানুষ আছে যারা ভালো কিছু সহ্য করতে পারে না! ভালো জিনিস গ্রহণ করবার ক্ষমতাও অনেকের থাকে না। ভালো জিনিস বলেই হয়তো তার চোখ-ধাঁধানো মনোহারিতা সেই।

আজ স্বীকার করতে লজ্জা নেই আমি তপতীর মতো ভালো নই। হয়তো যাকে ভালো বলে তা হবার মতো ঐশ্বর্য নেই আমার চরিত্রে। আমি ভালো হতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু দেখলাম ভালো জিনিসটা বড় আঁটসাঁটো, ইচ্ছেমতো নড়াচড়ার স্বাচ্ছন্দ্য নেই। তপতীর ভালোত্ব আমার স্বাধীনতাকে খর্ব করে, যেন অন্তঃশীল টানে আমাকে ওর চারপাশে ঘোরায়। অথচ, ট্রাজিডি এই: ওর এই ভালোত্বকে আমি অস্বীকার করতে পারিনে। কেমন এক নেশা আছে

এর আস্বাদে। আমার স্বার্থপরতা তা চুমুকে চুমুকে লেহন করে। আর, তখনই মনে হয় তপতীকে না-ভালোবেসে পারা যায় না। এই দোটানায় আমার জীবনটা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে, আমার সত্তা আধখানা হয়ে গেছে। আমি একই সময়ে আমার স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ এবং বিরক্তি বোধ করি।

সেদিন একটা মজার ব্যাপার ঘটল। আমার এক কলিগ্ মিঃ বোস ললাট দেখে মানুষের চরিত্র সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন। আমার সম্বন্ধে সেদিন আশ্চর্য মন্তব্য করলেন: 'আপনি পুলিসের চাকরিতে জয়েন করলে প্রচুর উন্নতি করতে পারতেন।' বললেন: 'আপনার মধ্যে দুটো মানুষ আছে ডক্টর জেকিল এণ্ড মিস্টার হাইড— দ্বৈত-ব্যক্তিত্ব আপনার মধ্যে কাজ করছে।' কথাটা শুনে রাগ হয়েছিল। কিন্তু মিঃ বোস যখন হেসে বললেন: 'ভয় নেই। আপনার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দেরও আপনি এই দুমুখো অস্ত্রে ঠকাতে পারবেন। কিন্তু আপনার কোনো ক্ষতি হবে না।' শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম।

আজ সে-মন্তব্য হঠাৎ আমার মনে পড়ল। দ্বৈত-ব্যক্তিত্ব! মনে হল একটা নিষ্ঠুর অদৃষ্টবাদ আমার অজ্ঞাতেই আমার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে।

সেবার শিমুলতলায় যখন গৌতমীর সঙ্গে আলাপ হল তখন আমার হাতে অস্ত্র রয়েছে অদৃষ্টবাদ আর দ্বৈত-ব্যক্তিত্ব। সাধারণ গেরস্থঘরের মেয়ে, বিদ্যার চেয়ে বয়েস বেশি বেড়েছে। শরীরের ভাঁজ থেকে আরম্ভ করে চোখমুখের হাসি আর লাবণ্যগুলি একেবারে নতুন সতেজ। আবেগ অনুভূতিগুলি কিশোরের মতো অপরিশীলিত এবং স্ফূর্ত। নিজের শক্তি সম্বন্ধে তিলমাত্র সজাগ নয়। শহরের যান্ত্রিক জীবনধারণের বাইরে এখানে এই শান্ত গ্রামীণ পরিবেশে আমার সংস্কার প্রবৃত্তিগুলি কেমন আদিম রূপ গ্রহণ করছিল। আমার

এতদিনে মনে হল আমার স্ত্রীর সংস্কৃতিসম্পন্ন মনের সঙ্গে আমার আন্তরিক যোগাযোগ নেই! আমার মনের কাঠামো ওর চেয়ে নিচুস্তরে বাঁধা। মনে হল: ওর পরিশীলিত বুদ্ধির তলায় আমার স্বাভাবিক মনটা বন্দী হয়ে ছটফট করছিল। অর্থাৎ গৌতমীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার পক্ষে আমি সুবিধে মতো দর্শন গড়ে তুলছিলাম। বয়েসের ব্যবধানের পাঁচিল আমি সহজেই ডিঙ্গিয়ে পার হলাম। গৌতমী কায়দাটা বুঝেছিল, বুঝে সে হেসেছিল। হেসে ভ্রুভঙ্গি করে তর্জনী তুলেছিল: 'আমি দিদিকে বলে দেবো।' দিদিকে বলেনি গৌতমী। দিদিকে আড়াল করেই সে আমার সান্নিধ্যে এসেছিল। অথচ আশ্চর্য, সে জানত আমি বিবাহিত, আমি পিতা, তা সত্ত্বেও আমার মুখের কথায় বিশ্বাস করবার জোর যে সে কোথায় পেয়েছিল, জানি না। আমার মতোই তপতীর সঙ্গে সে ভালোমানুষের অভিনয় করত।

শিমুলতলার ঘনিষ্ঠতা কলকাতায় এসে অন্তরঙ্গ রূপ নিল। সপ্তাহে তিনদিন গৌতমী আমার সঙ্গে দেখা করত। সমস্ত দেখার ব্যাপারটাই ছিল পূর্বপরিকল্পিত, আমার স্ত্রী তা জানত না। কোনো-দিন আপিসে যাওয়ার আগে আমার মাথা ধরত, আপিসে ছুটি নিতাম। তপতী চলে যেত কলেজে। আর দুপুরবেলায় হঠাৎ এসে পড়ত গৌতমী। এই সমস্ত মধুর মিথ্যাগুলি আমাদের উপভোগকে তীব্র তীক্ষ্ণ করে তুলত। চুরি করার থ্রিল ছিল আমাদের রক্তে।

বছর দুয়েক এইভাবেই গড়িয়ে গেল। গৌতমীর সঙ্গে আমার সম্পর্কের বিন্দুমাত্র টোল পড়েনি।

আজ ভাবি: আমার স্ত্রী কি আমাদের এই ডাকাতি, এই সিঁধকাটা সম্পর্কে কোনোদিন সন্দেহ করেনি; দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়নি? কেন? তপতী কি সত্যিই এত উদার, এত সংস্কারবিমুক্ত? ওর মুখের কথায় আমাদের এই নিভৃত রহস্য ভেঙে যেতে পারত। সে ভেঙে দেয়নি। হয়তো তপতী ছোটো হয়ে চায়নি, পারেনি।

কিন্তু আজ স্বচক্ষেই সে দেখল আমাদের প্রেমলীলার একটি স্থূল মুদ্রা। তা দেখেও তো সে ফেটে পড়ল না, অপমানিত বাঘের মতো গর্জে উঠল না। এমন সবংসহা হয়ে উঠল সে কি করে! নাকি, ভাবছে সে কী বলবে আমাকে, গৌতমীকে! কিংবা এই মুহূর্তে আর আমাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। যদি গৌতমীর সামনে আমি নিজের সম্মান বাঁচাতে ওকে আঘাত করে বসি। তাই কি? কিন্তু আমি সত্যিই ওকে কি ভাবে আঘাত করতে পারি? ওকে বলব তোমাকে আর ভালোবাসি না, তোমার সঙ্গ আমার কাছে অসহ্য! একথা বলা যায় না। কারণ একথা সত্য নয়। আমি স্ত্রীকে ভালোবাসি কিনা সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ থাকতে পারে, কিন্তু তপতীকে ছাড়া আমি থাকতে পারি না, একথা সন্দেহাতীত। তপতী নেই অথচ গৌতমী আমার জীবনে আছে, আমি ভাবতেই পারিনে। তপতী না-থাকলে গৌতমীও থাকবে না আমার জীবনে। কেন? আমি জানিনে। তপতী যদি এই মুহূর্তে দাবি করে গৌতমীকে তোমায় ছাড়তে হবে, আমি বিন্দুমাত্র চিন্তা না-করে হেঁটমুখে গৌতমীকে চলে যেতে দেবো। কারণ গৌতমীর সম্মানরক্ষার প্রশ্ন আমার নয়। তার আর আমার সম্পর্ক কোনো সম্মানজনক শর্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়—গৌতমী সেটা বোঝে এবং স্বীকারও করে। সে এবং আমি দুজনেই চোর, ওইখানেই শুধু আমরা পরস্পরের সাকরেদ। এমন অনিশ্চিতি সত্ত্বেও গৌতমী কেন আমার সঙ্গে এই খেলায় মাতল। নাকি তারও কোন নিশ্চিতি কোথাও ছিল না। এক-একসময়ে আশ্চর্য লাগে। আমার প্রয়োজনের আগুনে স্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলে উঠতে ও কখনো কোনোদিন আপত্তি করেনি। ও কোনোদিন বাধা দিয়েছে, শরীর খারাপ বলে কোনোদিন আমাকে প্রতিহত করেছে বলে আমার মনে হয় না। ওর চরিত্রে বাধাবন্ধহীন এই দুর্দমতা আমাকে বিস্মিত করেছে, ক্লান্ত

করেছে, কিন্তু ও কোনোদিন ক্লান্ত হয়নি। যেন ও বলতে চায়ঃ আমার অজস্র আছে, তাই খরচের ভয় নেই। আর ও যখন আরো অনেক দিতে পারবে তখন, তখন আমি সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি। ও আমাকে দিতে পারার প্রতিযোগিতায় হারাবে বলে ঠিক করেছে।

এখন গৌতমী কি করবে? সে চলে যাবে। কারণ থাকবার অধিকার তার নেই। সে-অধিকার সে চায়ওনি আমার কাছে। এমনকি আমার স্ত্রীকেও সে ঈর্ষা করে না। হয়তো স্ত্রীভাগ্যে ঈর্ষা করবার কোনো ঐশ্বর্য পায়নি সে। না: সামাজিক মর্যাদাকেও সে ঈর্ষা করে না বলে মনে হয়। সে তো বলতে পারত: আমাকে পেতে হলে ঘর ভাঙো বলতে পারত আমি তোমাকে সম্পূর্ণ করে পেতে চাই। কিন্তু কিছুই সে বলেনি। বলেনি। এখন আমার মনে হল গৌতমী মনে মনে আমাকে কাপুরুষই ভাবে। সে আমার বীরত্ব জানে। কাজেই এর বেশি আশা করে না। কিন্তু একথা ভেবে তো আমি শান্তি পাইনে। আমাকে যে সে কাপুরুষ ভাববে তাতে আমার পৌরুষ ধিক্কৃত হয়।

না। আমি আর ভাবতে পারছিনে। এরা কিছু করুক। তপতী ফেটে পড়ুক। ক্লাইম্যাক্সের চূড়ায় ঘটনা ছত্রখান হয়ে পড়ুক। আমি এই বোবা গুমোট সহ্য করতে পারছিনে।

গৌতমীর মস্তিষ্ক: (বছর বাইশ, যৌবন উদ্ধত, সুশ্রী, পরিচ্ছন্ন চেহারা. দীঘল আঁখিপল্লব, কাজলে গভীর একটু ক্লান্ত, চিন্তাচ্ছন্ন।) শিমুলতলায় আমাদের পাশের বাড়িতে এক গোধূলির আলোয় এই পরিবারকে দেখলাম, আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। ছোট্ট সংসার, স্বামী-স্ত্রী এবং একটি সন্তান। পোশাক-আশাক চেহারার মতোই এঁদের সংসারের ছিমছাম পরিচ্ছন্ন রূপ আমাকে আনন্দ দিয়েছিল। আমাদের সংসারে পরিচ্ছন্নতা কোথাও নেই, আমার বাবা উন্মাদ, মা শুচিবায়-

গ্রস্ত। মন এখানে নিয়ত মাথা খুঁড়ে মরে। আমার ক্ষুদ্র জীবন-বোধের ওপর এঁরা যেন এক উদার স্বাচ্ছন্দ্যের হাওয়া বয়ে নিয়ে এলেন। আমাদের বাড়ির জানালা থেকে ওঁদের সংসারের ঘরোয়া খণ্ড খণ্ড ছবিগুলি জলতরঙ্গের মতো আমার কানে বাজত। এই আকর্ষণই একদিন আমাকে এই বাড়ির সঙ্গে যুক্ত করল। হঠাৎ-ই আলাপ অন্তরঙ্গতার পর্যায়ে উঠে এল। ও বাড়ির প্রয়োজনীয় অতিথি হয়ে পড়লাম, যখন-তখন ও বাড়িতে আমার হাজিরা, একদিন না-গেলে ডাক পড়ত। আমরা একসঙ্গে বেড়াতে যেতাম। যেদিন দিদির সময় হত না সেদিন অরুণোদয়বাবুর সঙ্গে একাই বেরোতাম। অরুণোদয়বাবু না থেমে অনর্গল কথা বলতে পারতেন, অথচ বাড়িতে দিদির সামনে তাঁকে খুব কম কথা বলতে দেখেছি। আমিই যে তার কথার উৎস খুলে দিয়েছি, ভেবে আমার গর্ব হত।

আমার সঙ্গে বেড়াতে-যাওয়া অরুণোদয়বাবুর চেহারা একেবারে অন্য রকম। বাইরের কোনো লোক দেখলে আমাদের সম্পর্ককে ভুল করতে পারত। অরুণোদয়বাবু প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে আমাকে স্পর্শ করতে ভালোবাসতেন, কখনো হাত, কখনো বাহু। মাঝে মাঝে বুনো ফুল তুলে আমার খোঁপায় গুঁজে দিতে এক আমোদ অনুভব করতেন। কী আশ্চর্য, ওঁর দেয়া এই স্পর্শসুখকে আমি উপেক্ষা করতে পারতাম না। মনে মনে বিরক্ত হলেও না। পরে বুঝতে পেরেছি এই দুর্বলতাই আমার কাল হল।

কিন্তু সেদিন যখন আমার ডান হাত ওঁর হাতে তুলে নিয়ে একটি প্রস্তাব করলেন। আমি হাত ছাড়িয়ে নিয়েছিলাম। বলেছিলাম: 'আমি আপনাকে ওইভাবে ভাবিনি।' অরুণোদয়বাবু জোর করেননি। কেমন গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। সেদিন সারা রাত এক বিশ্রী চিন্তায় কেটেছে। দিদির জন্যে আমার কষ্ট হয়েছে। এই যদি অরুণোদয়বাবুর চেহারা হয়, সেটা খুবই দুঃখের। কিন্তু, আশ্চর্য লাগে অরুণোদয়বাবুর

বিষণ্ণ গম্ভীর মুখ আমাকে প্রেতের মতো তাড়া করত। আমার ব্যবহারে তিনি কষ্ট পেয়েছেন ভেবে আমার খারাপ লাগত।

পরে একদিন ওঁকে বলেছিলাম: 'আপনি আমাকে ভালবাসেন সেটা অন্যায় নয়। হয়তো আমিও আপনাকে বাসি। কিন্তু একে শরীরের সম্পর্কে আনবেন না। কারণ সে-সম্পর্ক আপনার একমাত্র দিদির সঙ্গেই হতে পারে।'

অরুণোদয়বাবু জোর করেননি।

ওরা কলকাতায় চলে গেলেন। আমি বাঁচলাম। কিছুদিন পরে আমরাও কলকাতায় ফিরে এলাম। অরুণোদয়বাবুকে এড়াতে ওকে ভুলতে চেষ্টা করে যখন সফল হয়েছি মনে হল এমন সময় কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে দেখা। রাস্তায় দাঁড়িয়েই তিনি হঠাৎ ঝগড়া শুরু করলেন আমার সঙ্গে। পরের দিন দেখা হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়ার পর আমি কোনো রকমে পালিয়ে আসতে পারলাম।

বাড়িতে পৌঁছে আমি খুব ভাবলাম। কিন্তু বিকেল হতেই আমি নেশাগ্রস্তের মতো বেরিয়ে পড়লাম। অরুণোদয়বাবু আমাকে রেস্টুরেন্টের পর্দাটানা ক্যাবিনে টেনে নিয়ে গেলেন। তুপ্লেট পুডিঙ সামনে রেখে অতর্কিতে তিনি আমাকে আবেগের তরঙ্গে ভাসিয়ে দিলেন। আমি কাঁদলাম, কেঁদে হারলাম।

আমি অরুণোদয়বাবুকে ঘৃণা করি, আমার ঘৃণার যদি দাহ্যশক্তি থাকত তাহলে ওঁকে আমি নিঃশেষে পুড়িয়ে মারতাম। কিন্তু ভালবাসার মতো ঘৃণারও যে আকর্ষণ আছে, তা আমি জানতাম না। অরুণোদয়বাবুর সমস্ত চালচলন আচার-ব্যবহার ঠানদিদির রামায়ণ পড়ার মতো আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। আমাকে খাদ্যবস্তুর চেয়ে বেশি সম্মান তিনি কোনোদিন দেননি। ওঁর এই বাড়াবাড়ি দেখে এক-এক সময় মনে হত অরুণোদয়বাবু এখনো অবিবাহিত, অন্তত তাঁর জেদ দেখে তাই মনে হত। এখন বুঝতে পারি অরুণোদয়বাবুর

নিপুণ অভিজ্ঞতাই ইচ্ছের বাইরে আমার দেহে ঝড় ডেকে আনত। সে-ঝড়ের প্রমত্ত উল্লাসকে অস্বীকার করি সে শক্তি আমার ছিল না।

আমি এ-সংসারে অভিশাপ ডেকে আনছি, দিদিকে প্রতারণা করছি, আমাব সর্বদা মনে হত। ধরা পড়লে কি হবে, তাও আমি ভাবতে পেরেছিলাম। অরুণোদয়বাবু যে আমাকে কোনোদিন সামাজিক সম্মানের আসন দেবেন না সে কথাও আমি ভালো করে জানতাম। কিন্তু, আমার ফেরার পথ ছিল না। বরং এই সমস্ত দুর্ভাবনাকে জয় করতে আমি আরো বেশি ওঁর আবেগের প্রশ্রয় দিতাম। অস্বাভাবিক মাতাল হয়ে থাকতে চাইতাম।

আমার আজকাল ক্লান্ত লাগে। আমার জীবন অন্ধকার। ভবিষ্যতের কোনো পথ আমি খুঁজে পাইনে। নতুন করে জীবন আরম্ভ করব সে-উদ্যমও আর খুঁজে পাইনে। আমি বাজে, অকেজো মেয়ে। আমার শরীর ছাড়া কিছু নেই, আর সে-শরীরও বহু ব্যবহারে পুরনো হয়ে গেছে। আমার কাছে বেঁচে-থাকা টিঁকে-থাকার একটা গতানুগতিক রুটিন ছাড়া কিছু নয়।

আমি চলে যাব, আমাকে ধরে-থাকার কেউ নেই। দিদি আমাকে ক্ষমা করতে পারবেন একদিন, বিশ্রী স্বপ্নের মতো আমাকে ভুলতে পারবেন। হয়তো আমাকে একদিন বুঝতে তাঁর অসুবিধে হবে না। আমি তাঁদের সংসারকে বাঁচিয়েছি। ওঁর স্বামীকে আমি নামতে দিইনি। সমস্ত বিষ আমার অঙ্গে ধারণ করে ওঁকে আমি আটকেছি। অন্য মেয়েকে তাঁর ধারেকাছে ঘেঁসতে দিইনি। অনেক ক্ষতি হতে পারত, অনেক ক্ষত নিয়ে সে-ক্ষতিকে আমি রুখেছি।

আমার রক্তাক্ত হৃদয়ের কাহিনী কেউ জানে না। সে কাহিনী আমার একার। অরুণোদয়বাবু আমার মনকে কোনোদিন জানতে চাননি, তাঁর কাছে আমার হৃদয়ের অস্তিত্ব নেই। আমার ছোটো-

খাটো সুখদুঃখ শোনবার ধৈর্য তাঁর নেই, আর আমিও হৃদয়-জ্বালা বলতে না-পেরে বেঁচে গেছি।

রাত বাড়ছে। এবার আমাকে উঠতে হয়। কিন্তু এঁরা কেউ কিছু বলছেন না কেন! দিদি কেন বের করে দিচ্ছেন না আমাকে। আমার অপরাধ তো প্রমাণিত হয়ে গেছে।

তপতী প্রথম কথা বলল: 'শান্তনুর আজকেও আবার জ্বর বেড়েছে। তুমি ডাক্তারের কাছে একবার যাও।'

'জ্বর বেড়েছে।' অতিরিক্ত ব্যস্ত হয়ে উঠল অরুণোদয়: 'কই এতক্ষণ আমাকে বলোনি তো।'

অরুণোদয় হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল।

নির্জন ঘরে এখন দুই নারী।

তপতী বলল, 'কফি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।'

গৌতমী বলল, 'থাক। আপনাকে আবার কফি করতে যেতে হবে না। আমি এবার যাব।'

'একটু বোসো।' তপতী বলল।

উঠে গিয়ে রেডিয়োটা বন্ধ করে দিল তপতী। ফিরে এসে চেয়ারে বসল। তারপর একটু থেমে কোনো দিকে না-তাকিয়ে প্রশ্ন করল: 'এখন তোমরা কি করতে চাও?'

গৌতমী বলল, 'আমি জানি না।'

তপতী ওর মুখে চোখ রাখল। 'না-জেনে এতদূর এগিয়েছ।'

গৌতমী মুখ নিচু করল।

'তুমি অরুণোদয়কে ভালোবাসো?'

'আমি বুঝতে পারিনে।'

'ভালোবাসো কিনা তাও বোঝো না! আশ্চর্য তো!' তপতী বলল।

'তোমার কি মনে হয় অরুণোদয় তোমাকে ভালোবাসে?'

'সে কথা তিনি অনেকবার বলেছেন আমার কাছে।'

'তুমি বিশ্বাস করেছ?'

গৌতমী শীর্ণ হাসল। 'বিশ্বাস না করলে কাছে আসব কি করে?'

'কিন্তু তুমি জানতে ওর স্ত্রী আছে, ছেলে আছে···'

'জানতাম বৈকি। তিনি তো কোনো কিছুই গোপন করেননি আমার কাছে।' গৌতমী হাই তুলল: 'এমন কি তিনি তাঁদের খুব ভালোবাসেন এ কথাও বলেছেন অনেকবার।'

'ও।' তপতী বলল। 'এত জেনেও...?'

'হ্যাঁ।' গৌতমী বলল: 'উনি আমাকে বলেছিলেন বিবাহিত লোকদের ভালোবাসবার অধিকার নেই, একথা বিশ্বাস করেন না।'

'তার মানে—' তপতী উষ্ণ হল: 'ভালোবাসা কবার আসে জীবনে।'

'একথা ওঁকে জিগ্যেস করবেন।'

'করব। কিন্তু তোমার কাছে আমি কিছু রুচি সংস্কৃতির প্রমাণ আশা করেছিলাম।'

গৌতমী বলল, 'আমি তো শিক্ষিত নই। আমার কাছে অতটা আশা করেছিলেন কি করে? তার জন্যে আমি দায়ী নই।'

'মেয়ে হয়ে আরেকটি মেয়ের সর্বনাশ করতে আটকাল না তোমার?'

গৌতমী বলল, 'আমি জানতাম শেষ পর্যন্ত আপনি আমাকে এই অভিযোগই দেবেন।' ওর মুখের চেহারা আশ্চর্য শান্ত অথচ কঠিন। 'আপনি আমার শক্তিতে খুব বিশ্বাস রেখেছেন দেখছি। মাত্র দু'বছরের ঘনিষ্ঠতায় আপনাদের এতদিনকার সংসারের সর্বনাশ ডেকে আনব, একথা বিশ্বাস করি কি করে!'

তপতী ওকে বাধা দিয়ে কী বলতে যাচ্ছিল, গৌতমী থামাল ওকে: 'আমাকে শেষ করতে দিন। এই দীর্ঘ দশ বছরেও যে

স্বামীকে অপনি চিনতে পারেননি সেইটেই আমার কাছে আশ্চর্য লাগে।'

তপতী রেগে উঠল : 'আমার স্বামী সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করবার কোনো অধিকার তোমার নেই।

গৌতমী ধীর গলায় বলল, 'আপনার স্বামী আমার কাছে একজন পুরুষ মানুষ ছাড়া কিছু নন। এবং সে পুরুষটি সম্বন্ধে মন্তব্য করবার অধিকার আমার আছে।'

তপতী বলল, 'ওটা ওর একধরনের অসুস্থতা...'

গৌতমী বললে, 'তবে শুশ্রূষা করে আরাম করেননি কেন সে-অসুখের। জানেন অসুস্থ লোক তার অসুখ সমাজের আরো দশজনের ওপর ছড়িয়ে দেয়।'

'বারে! আকি কী করব, কী করতে পারি...'

'পারতেন। যদি আপনার শিক্ষার অহংকার থেকে নেমে আসতে পারতেন। যদি অতটা নিঃস্বার্থ উদার হবার অভিনয় না করতেন। যদি ওঁকে প্রশ্রয় না দিতেন...'

'আমি, আমি ওকে প্রশ্রয় দিয়েছি!' বিবর্ণ ফ্যাকাশে গলায় আর্তনাদ করে উঠল তপতী।

'দিয়েছেন।' কঠিন গলায় বলল গৌতমী : 'আপনার মতো আপনার স্বামীকে চেনে কে! রোজকার ব্যবহারে আপনি কি পেয়েছেন ওঁর কাছে? মেয়েদের কোনো সম্মান দিতে তিনি জানেন, মেয়েদের মন আছে সেকথা তিনি বিশ্বাস করেন?'

'গৌতমী!'

'হ্যাঁ। এর পরেও আপনি কি করে এতদিন ভেবে নিশ্চিন্ত ছিলেন আমাদের সম্পর্ক খুব পবিত্র। মেয়ে বলে আমাকে উনি সম্মান দেন?'

তপতী অনেকক্ষণ চুপ থেকে বলল, 'এত বুঝেও তুমি এই আবর্তের মধ্যে এলে কেন?'

গৌতমী প্রথমে বলল, 'জানিনে।' তারপর একটু চিন্তা করে: 'হয়তো প্রথমটায় মেয়েলি লোভ, কৌতূহল দেখি-না-কি হয়! তারপর একদিন নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। দেখলাম আমাকে উনি তৈরী করে ফেলেছেন, আমার অনুভূতি-ইন্দ্রিয়গুলিকে তিনি এক ভালো-লাগা স্বাদে ভরে তুলেছেন। আমি সুখ পেলাম। তখন ভাবলাম যে-সুখ আমাকে আনন্দ দেয় তা মিথ্যে নয়, অন্যায় নয়। মিথ্যা বা অন্যায় হলে আমি সুখ পাব কেন?'

তপতী মূক-বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল গৌতমীর দিকে; মনে হল মেয়েটির ব্যক্তিত্বে একটা নির্দয় নিষ্ঠুরতা আছে যা তাকে আহত করছে। তারপর যেন যুক্তি পেয়েছে এমন গলায় বলল, 'কিন্তু তোমার সামনের জীবনটা, তোমার ভবিষ্যৎ...'

গৌতমী রুক্ষ হাসল। 'আমার বাবা উন্মাদ মা অসুস্থ। আমার লেখাপড়া হল না। আমায় যে ওঁরা বিয়ে দেবেন সে-আশাও আমি রাখিনে। তাই হাতের কাছে যা পেলাম তাকে ফিরিয়ে দিতে ভরসা পেলাম না।'

'আশ্চর্য।' তপতী বলল: 'কিন্তু একবারও ভাবলে না একজন বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে তোমার সম্পর্কের মানেটা কি হয়?'

গৌতমী বলল, 'ভেবেছি। কিন্তু তাতো সত্যি নয়। তিনি তো আমাকে বাঁধেননি, আমার আসা যাওয়ার পথ খোলা আছে। তিনি আমাকে টাকা দেন না, আমার সুখ-সুবিধের কোনো ব্যবস্থাই তিনি করেন না।'

তপতী পঙ্গু নিস্তব্ধতায় বসে রইল। দেহের সমস্ত রক্ত জমে যেন পাথর হয়ে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে তার গায়ে যদি কেউ ছুঁচ বসিয়ে দেয় কোনো প্রতিক্রিয়া হবে না তার। এই মেয়েটির থেকে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের স্বাতন্ত্র্য সে এতদিন অনুভব করত। কিন্তু আজ মনে হল বইয়ের জগতের চেয়েও সে এই রক্ত-মাংসের জগৎটাকে বেশি চিনেছে।

হোক তার জীবনবোধ অসংস্কৃত অশালীন, তবু জোর আছে তার ভাবনার। এ মেয়েকে হারাতে পারবে না তপতী। এ মেয়ের কাছে হারজিতের কোনো দাম নেই। ওর-কাছে তার শিক্ষার পলেস্তারা খসে গেছে, নগ্ন হয়ে গেছে দাম্পত্য জীবন। যে স্বামীকে সে চিনতে পারেনি, তার স্বরূপকে সে অল্প দিনেই ধরেছে। 'এই আমার সংসার'—তপতী কান্নাগলা গলায় বললে। 'এর কোন্‌খানে আমার গৌরবের আসন আছে। আমি মা, এটা কোনো বিশেষ ঘটনা নয়। যদি-না থাকে পিতৃত্বের অলংকার।'

গৌতমী উঠে দাঁড়াল। 'আমি এবার যাই—'

'না। ও আসুক।' তপতী বলল।

'রাত হয়ে যাচ্ছে যে।'

'হোক।'

অরুণোদয় ঘরে পা দিয়ে বলল, 'ডাক্তার এলেন না। এই ওষুধ দিয়েছেন।'

তপতী বলল, 'বোসো।'

অরুণোদয় বসল।

'গৌতমীকে বসিয়ে রেখেছি। ও আজ এখানেই খেয়ে যাবে।' তপতী বলল।

তপতী ওষুধ হাতে বেরিয়ে গেল।

দুজনে নিঃশব্দ। যেন একটা মৃত শবকে স্পর্শ করে দুজনে বসে রয়েছে। তারপর অরুণোদয়ই প্রথম কথা বলল, 'তুমি এখনো বাড়ি গেলে না কেন?'

গৌতমীর ঠোঁট জোড়া বিস্ফারিত হল। 'আপনি এগিয়ে না দিলে যাব কি করে?'

'তার মানে?'

'বারে। রাস্তায় একলা পেয়ে বলবেন না কখন আবার আসতে হবে?'

'আর আসতে হবে না।' অরুণোদয় বলল কঠিন গলায়।

'কেন? আমার অপরাধ?'

'এর পর আর তোমার এখানে আসা চলে না। সেটা ভালো দেখায় না।'

'বেশ তো।' গৌতমী বলল: 'বাইরে কোথায় দেখা করব বলুন? হোটলে রেস্তোরাঁয়?'

'না। তার দরকার হবে না।'

'বেশ। তাহলে আমি চলি।' গৌতমী এবার উঠে দাঁড়াল।

'দাঁড়াও।' অরুণোদয় বলল: 'কী কথা হচ্ছিল এতক্ষণ তোমাদের? কি কি বললে তপতীকে?'

একটা সুতীব্র ঘৃণায় সমস্ত শরীর শিখার মতো জ্বলছিল গৌতমীর। চেয়ারের হাতল ধরে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে, একটু একটু কাঁপছিল, চোখ দুটো ধিকিধিকি করে জ্বলছিল। বিষাক্ত বিস্বাদ গলায় গৌতমী বলল: 'মনে পড়ে এক গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দুপুরের কথা আপনার? দিদি ভোরবেলায় বেরিয়ে গিয়েছিলেন কলেজের সিমার-পার্টিতে। আপনার আদেশ মতো সেই সকালে দিদির চলে যাওয়ার সময়টুকু অপেক্ষা করে আসতে হল আমাকে। আমি চান করলাম, ভিজে চুল এলিয়ে দিয়ে রান্না করলাম আপনার জন্যে, যত্ন করে খাওয়ালাম আপনাকে। মনে পড়ে সেদিন আপনি আমাকে দিয়ে দিদির সমস্ত পার্টই করিয়ে নিয়েছিলেন। একদিন শুধু একদিন আমি আপনার নকল স্ত্রী সেজেছিলাম। এবং সেদিনের সেই মিথ্যা সাধকে আমাকে এই কমাস লালন করতে হয়েছে, রক্তে মাংসে সে একটা মানুষের আদল নিচ্ছে ..'

ভয়ে বিবর্ণ কেঁপে-ওঠা গলায় অরুণোদয় বলল, 'মিথ্যে কথা, সব তোমার বানানো।'

'চুপ করুন।' তীব্র গলায় ধমকে দিল গৌতমী। মিথ্যে কি

সত্য তা আপনার চেয়ে ভালো করে কে জানে। আমি কোনো দিন কোনো কারণে আপনার কাছে আসব না। আমি চাই ওর পিতৃত্বকে আপনি স্বীকার করবেন।'

'না কিছুতেই না। আমি এর কিছুই স্বাকার করিনে।' অরুণোদয় চিৎকার করে উঠল।

গৌতমী বলল, 'দরকার হলে আমাকে পুলিশের আশ্রয় নিতে হবে।' ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল সে।

অনেক রাত পর্যন্ত ছেলের রোগ-শয্যার পাশে স্থির বসে ছিল তপতী। অরুণোদয় বারান্দায় পায়চারি করছিল। মাঝে মাঝে উঁকি মারছিল ঘরে, ঢোকেনি। তপতীও ডাকেনি। তারপর শেষ রাত্রে ক্লান্তিতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল তপতী।

ভোরে ঘুম ভাঙল ওর। শান্তনু তখন ঘুমিয়ে। আলনা থেকে তোয়ালে-কাঁধে তপতী বাথরুমে পা দিল। পা আটকে গেল ওর, ভয়ার্ত গলায় চীৎকার করতে গিয়ে স্বর বেরুল না। বিবর্ণ ধূসর দৃষ্টিতে সে তাকিয়েই রইল।

বাথরুমের চৌবাচ্চার গায়ে হেলান দিয়ে অরুণোদয়ের দেহটা শক্ত কাঠের মতো আটকে রয়েছে, লম্বা ঘাড়টা ভেঙে পড়েছে বুকের ওপর, রক্তের তাজা ধারাটা গলা বেয়ে কোমর বেয়ে পা স্পর্শ করে চৌবাচ্চার উপছে-পড়া জলের সঙ্গে মিশে একটা অদ্ভুত রঙ ধারণ করেছে। ধারালো রেজারটা ছিটকে পড়ে আছে মেজেতে।

দর্শনের ছাত্রী তপতীর মনে হল : ওটা একটা মানুষের কাঠামো নয়, একটা শতাব্দী, অস্থির অশক্ত ভগ্ন খর্ব, রুধির ঢেলে তার ঋণ শোধ করছে।